

মিনারের কান্না

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী

সংকলন ও অনুবাদ

মুফতী মুআজ আহমাদ

নাজেমে তালীমাত, জামিয়া মুহাম্মাদিয়া
মিরপুর-১, ঢাকা।

সম্পাদনায়

মুফতী হেদায়াতুল্লাহ আশরাফী

মুহাদিস, রসুলপুর জামিয়া ইসলামিয়া (মাদরাসা)
আব্দুল্লাহপুর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

প্রকাশনায়

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আগুনা]

অনুবাদকের আর্য

সকল প্রশংসা আমার আল্লাহর জন্যে নিবেদিত গোটা বিশ্বচরাচর যার করুণার ভিখারী। তাঁর অশেষ করুণা সহায় না হলে এই পঙ্কিল জীবন এদুর অগ্রসর হত না। তাঁর করুণা আছে বলেই এখনো তিনি আমাকে দীনি খেদমতের সাথে জড়িয়ে রেখেছেন।

ড. শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী ইতিমধ্যেই আরব সীমানা পেরিয়ে বিশ্বময় পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি মুখ। তাঁর আবেগ ও দরদমাখা কথাগুলো পাষণ হৃদয়কেও বিগলিত করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দাওয়াতী কাজকে আরো বেগবান করুন এবং তাঁকে সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

আমি শায়েখ আরিফীর বয়ান সংকলন রাকাইক, রাওয়ায়ে ও বাদায়ে থেকে কেবল আরকানে ইসলামের ওপর প্রদত্ত পাঁচটি বয়ান নির্বাচন করে তার অনুবাদ করেছি। অবশ্য যাকাত বিষয়ক আলোচনার আংশিক নেট থেকে সংগ্রহ করেছি। এ বয়ানগুলোতে ইসলামের মৌলিক পাঁচ স্তম্ভের স্বরূপ ও তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ওঠে এসেছে সুস্পষ্টভাবে। অবশ্য তাঁর বক্তব্যের দরদ ও ঝংকার পাঠককে নিজ থেকে উপলব্ধি করে নিতে হবে। কারণ অনুবাদের কাঁচা হাতে আমি তা ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। এ দায় ও ব্যর্থতা আমার, তাঁর নয়। ভিন্ন মাযহাবের অনুসারী; বিধায় তাঁর মাসআলাগত কিছু ভিন্নমত রয়েছে। ফলে প্রয়োজন মনে হওয়ায় আমাদের মতটিও যথাস্থানে উল্লেখ করে দিয়েছি।

এ সংকলনটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে যিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন তিনি আমার অস্তিত্বের উৎস, আমার সকল কর্মপ্রয়াসের অনুপ্রেরণা, আমার কাছে যিনি দুনিয়ার বুকে একজন জান্নাতী মানুষের প্রতিচ্ছবি; আমার শঙ্কেয় আব্বা। আমার ওপর আব্বার ছায়া আরো সুদীর্ঘ হোক; করুণাময় আল্লাহর কাছে এটাই আমার সবচেয়ে বড় জাগতিক চাওয়া। এ শুভলগ্নে স্মরণ পড়ে আমার শঙ্কেয় ও প্রিয় উস্তাদ ঐতিহ্যবাহী জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহতারাম নাযেমে তালিমাত মুফতী আশরাফুজ্জামান (দা.বা.) কে, হযুরের সুদৃষ্টি সহায় না হলে আমার শিক্ষাজীবন হয়ত পথ হারাত! আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর আফিয়াত ও দীর্ঘ হায়াতের দুআ করছি। স্মরণ করতে

হয় আমার সহকর্মী প্রতিভাবান মুফতী হাসান মুহাম্মদ শরীফকে, অনুবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সবার মতো আমিও চেয়েছি সুন্দর কিছু করতে, কিন্তু সীমিত সাধ্যের কাছে অসীম সাধের কী দাম! অনুবাদকের অযোগ্যতাকে পাশ কাটিয়ে সহৃদয় পাঠক যদি বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও বক্তার অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন তাহলে এ সংকলনটিও হতে পারে জীবন গড়ার পাথর। ভুলগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার করজোড় অনুরোধ রইল। আপনার সুপারামর্শে ধন্য হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকব।

হয়ত এই সংকলনটি কারো জীবনের পরিবর্তন বা আমলের ক্ষেত্রে সামান্য উপকারে আসবে আর সেই উসীলায় আমার রব আমার নাজাতের ফয়সালা করে দিবেন, সেই প্রত্যাশাতেই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। সকলের কাছে দুআর দরখাস্ত যেন আল্লাহ তাআলা দীনি কাজের যোগ্যতা, তাওফীক ও ইখলাস দান করেন। আমীন!

মুফতী মুআজ আহমাদ
নাজেমে তালীমাত, জামিয়া মুহাম্মাদিয়া
মিরপুর-১, ঢাকা।

সূচী। পাত্র

তাওহীদ : মুক্তির সনদ	৯
শিরকের উত্তাল সমুদ্রে	১০
মুক্তির পথ	১৪
যেভাবে হয়েছিল বিকৃতির সূচনা	১৬
নবীযুগে তাওহীদ ও শিরকের স্বরূপ এবং সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি	১৭
শিরকের ব্যাপারে শৈথিল্য!	২১
দরগা ও দুর্গার পূজার মাঝে কোনো বিভাজন নেই	২৪
বালক ও আখরোট পূজারীর গল্প	২৬
তাওহীদের পূণ্যভূমি আরব ভূখণ্ডের নায়ুক অবস্থা	২৭
মাযারীদের কিছু প্রশ্নের জবাব	৩০
শিরকের বিভিন্ন রূপ ও কবর যিয়ারতের মাকসাদ	৩৪
দেবীর বিনাশ সাধন	৩৭
শিরকের উৎস সন্ধানে	৩৯
যেভাবে শিরক দানা বাঁধে	৪১
যে উসীলা গ্রহণ শরীয়তে বৈধ	৪৪
গাইরুল্লার নামে উসীলা গ্রহণ ও কসম করার শরয়ী বিধান	৪৫
জাদুকরের দণ্ড	৪৮
ঈমান বিনাশী কর্ম	৫০
মুরতাদের পরিচয়	৫৬
শেষ ফরিয়াদ	৬০
মিনারের কান্না	৬৩
নামাযের গুরুত্ব	৬৪
নামায ও মেরাজ	৬৫
নামাযেই ইবরাহীম আ.এর মুক্তি	৬৭
বিপদে-মসীবতে নবীজি সা.-এর নামায	৭০
মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার নামায	৭২
জাগতিক প্রয়োজনেও নামায	৭৩
অন্যায় প্রতিরোধে নামায	৭৫

সিজদার মাহাত্ম্য	৭৬
অযুর ফযীলত ও বেনামাযীর পরিণতি	৭৯
সিজদার আলামত	৮২
সালফে সালেহীনের নামায	৮৪
সুফিয়ান সাওরী ও খলীফা মানসুর	৮৫
কাজিত নামায	৮৮
সুনত ও নফল নামাযের প্রয়োজনীয়তা	৮৯
নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা	৯০
বান্দার নামাযে আল্লাহর আনন্দ	৯১
নামায : শয়তানকে বিতাড়িত করার অনন্য উপায়	৯২
বেনামাযীর শাস্তি	৯৪
বেনামাযী ও নামাযী ব্যক্তির মৃত্যু	৯৫
জামাতের গুরুত্ব	৯৮
আসলাফের জামাতের গুরুত্ব	১০১
মসজিদে আগে আসার ফযীলত	১০২
অধীনস্ত ও আপনজনদের নামায পড়তে বলুন	১০৩
সুনত তরীকায় নামায	১০৫
যাকাতের শরয়ী আহকাম	১০৭
যাকাত অনাদায়ের পরিণতি	১০৮
কখন যাকাত দেয়া ফরয	১০৯
প্রাণীর যাকাতের বিধান	১১০
স্বর্ণ-রূপার যাকাতের বিধান	১১১
বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত	১১৩
আসলাফের দানের নমুনা	১১৫
সদকায়ে ফিতরের আলোচনা	১১৬
যাকাতযোগ্য সম্পদ	১১৮
যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কারা?	১১৯
রোযার পয়গাম	১২৩
রমযানের আগমনে রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের আনন্দ	১২৩
রোযার ফযীলত	১২৫

সালফে সালেহীনের নিকট রোযার অবস্থান	১২৮
রোযা রাখায় সালফে সালেহীনের মুজাহাদা	১৩০
রোযার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য	১৩২
রমযান আপনার মাঝে সংকল্পের দৃঢ়তা আনয়ন করবে	১৩৬
রমযানের পরিবেশগত সুযোগকে গ্রহণ করুন.....	১৩৬
ইহুদী জাতি ও কল্যাণের সুযোগকে হেলায় নষ্ট করার ইতিহাস.....	১৩৭
পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবল	১৫১
যে অবস্থাতেই থাকুন শোকরঙয়ার হোন.....	১৫২
মুমিনের আত্মার স্বচ্ছতা	১৫৩
রমযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য দ্বীনের দাওয়াত	১৫৮
রমযান সচ্চরিত্র অনুশীলনের অফুরন্ত সম্ভবনা.....	১৬২
রোযা বিষয়ক কয়েকটি মাসআলা	১৬৫
বাইতুল্লাহর মুসাফিরের পাথেয়	১৭৫
বাইতুল্লাহর আশেক	১৭৫
নিদায়ে ইবরাহীম	১৭৯
হারাম শরীফের মর্যাদা	১৮২
রাসূলুল্লাহর হজ্জ	১৮৪
পবিত্র এহরাম, বিনম্র হৃদয়.....	১৮৫
নূরানী কাফেলার নয়নাভিরাম দৃশ্য	১৮৯
আরাফার মাহাত্ম্য	১৯০
আরাফায় সালফে সালেহীন	১৯৫
হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত	১৯৬
হজ্জের মাকসাদ ও চেতনা	১৯৮
হজ্জের প্রস্তুতি.....	২০১
হজ্জ কখন ফরয হয়?.....	২০২
হজ্জের মীকাত	২০৩
এহরামের নিয়ম	২০৪
তওয়াফের নিয়ম	২০৬
সাফা-মারওয়ায় সায়ীর নিয়ম	২০৮
মাথা মুণানো বা চুল ছাটার বিধান	২০৯
মিনা থেকে সূচনা.....	২১০

আরাফায় অবস্থান	২১০
মুযদালিফায় রাতযাপন	২১১
শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ.....	২১২
কুরবানী	২১৩
মাথা মুণানো	২১৪
তওয়াফে যিয়ারাত ও সায়ী.....	২১৫
বাচ্চাদের হজ্জ	২১৮
মহিলাদের হজ্জের বিধান.....	২১৯
বদলী হজ্জ	২২০
এহরামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী.....	২২২

তাওহীদ : মুক্তির সনদ

الحمد لله الذي رضي الاسلام لعباده ديناً ونصب الأدلة على ألوهيته و بينها
تبيناً و كفى بربك هادياً و معيناً لم يتخذ ولداً و لم يكن له شريك في الملك و
كبره تكبيراً يعطي و يمنع و يخفض و يرفع و يصل و يقطع و لا يسأل عما يقضي
و يصنع لا شريك له في ملكه و لاند له في حكمه و لا ظهير له و لا وزيراً له
ولا شبيه له و لا نظير له ذلت الجبابرة لعزته و انكسرت النفوس لهيبته و خشعت
الأصوات لعظمته وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله و صفيه و خليفه صلى الله و سلم و بارك عليه ما ذكره الذاكرين
الأبرار ما تعاقب الليل و النهار و نشكر الله أن يجعلنا من أمته ونسئله أن يحشرنا
يوم القيامة في زمرة.

শিরকের উত্তাল সমুদ্রে

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! পৃথিবী এক সময় মুশরিকে সয়লাব ছিল। চারদিকে
ছিল তাগুতের জয়জয়কার। ছিল শিরকের প্রতাপ ও মহামারী। কেউ
মূর্তিকে খোদা বলে ডাকত। কেউ পাথরের পূজা করত। অঞ্চল ও
গোত্রভেদে বহু দেবদেবীর আরাধনায় নিমজ্জিত ছিল গোটা বিশ্ব।

সে সময়ের কথা! মদিনার এক মুশরিক সর্দার আমর ইবনে জুমুহের একটি
মূর্তি ছিল। মূর্তির নাম ছিল মুনাফ। আমর সেই মূর্তির পূজা করতেন।
সারাক্ষণ তার কাছে পড়ে থাকতেন। স্বীয় স্ত্রী-সন্তান ও ধন-সম্পত্তির
চেয়েও পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া মূর্তি আমরের কাছে বেশি প্রিয় ছিল।
মদীনায় প্রাচীনকাল থেকেই মুনাফের পূজার রেওয়াজ ছিল। মুনাফ কিংবা
অন্যান্য মূর্তির জন্য নিজের নফস ও সম্পদ বলি দেওয়াকে মদীনাবাসীরা
গর্বের বিষয় মনে করত। শুধু মদীনা নয়, সারা পৃথিবীতে তখন এমন
রেওয়াজই বিরাজমান ছিল।

সর্দারের বয়স ষাট বছর পার হল। ইতিমধ্যে মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করে হযরত মুসআব বিন উমায়ের রাযিকে দীনি শিক্ষা ও তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে মদীনায় পাঠিয়েছেন। হযরত মুসআবের দাওয়াত ও তাবলীগের বদৌলতে আমার বিন জুমুহের সন্তানরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মনে আকাজ্জা জাগল যে, তাদের পিতাও ইসলাম গ্রহণ করুন। তারা জানতেন, বিষয়টি খুব সহজ নয়। তবু বুকভরা আশা নিয়ে ছেলেরা পিতার কাছে হাযির হলেন। বললেন, ‘আব্বাজান! আমাদের এলাকায় একজন বুয়ুর্গ ব্যক্তি এসেছেন, যিনি হাজারো দেবদেবী ও মূর্তির পূজা বর্জন করে এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে বলেন। সকলেই তার কাছে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি কেন তার কাছে যাচ্ছেন না? একদিন চলুন না তার কাছে!’ সন্তানদের কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল।

আমর পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, ‘কেন আমাকে তার কাছে যেতে হবে? আমার কি কোনো ইলাহ নেই? আমি কিছুতেই ওই লোকের কাছে যাব না। কারণ আমার রয়েছে মুনাফ। মুনাফ ছাড়া আর কারো ইবাদতের আমার প্রয়োজন নেই। মুনাফই আমার সব সমস্যার সমাধান করবে।’ সর্দারের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুর।

সন্তানরা বললেন, ‘তবু একবার চলুন না তার কাছে। তাঁর কথা অন্তত শুনুন। তাঁর কাছে যেতে বা তাঁর কথা শোনায় তো ক্ষতির কিছু নেই।’

সন্তানদের পীড়াপীড়িতে এক পর্যায়ে আমার হযরত মুসআবের কাছে যেতে সম্মত হলেন। তারপর সময়-সুযোগ করে একদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। কিছু কথাবার্তা হল। সেখান থেকে ফিরে আসার পর মুনাফের সাথে আমার এক হাস্যকর ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাটিই প্রথমে আমি আলোকপাত করতে চাই; এতে মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে জাহেলী যুগের হালত কতটা নায়ুক ছিল তা কিছুটা হলেও আপনারা অনুমান করতে পারবেন।

আমর ইবনে জুমুহ মদীনার পথে চলছেন। তখনকার মদীনা বর্তমানের মতো ছিল না। কিছু পুরাতন ঘরবাড়ি ও গাছপালা; এই ছিল মদীনার সাধারণ চিত্র। আমার মুসআব বিন উমায়েরের কাছে এসে স্থির হয়ে বসলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কিসের দাওয়াত দেন? কার ইবাদত করতে

বলেন?’ মুসআব জবাব দিলেন, ‘আমি যে আল্লাহর কোনো শরীক নেই, সেই এক আল্লাহর ইবাদতের ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিই।’

তারপর হযরত মুসআব আমার ইবনে জুমুহকে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। কুরআন তিলাওয়াত শুনে আমার খুবই অভিভূত হলেন, কিন্তু তার এ ভালোলাগা ও অনুভূতির ব্যাপারটি গোপন রেখে বললেন, ‘আমি আমার কওমের সর্দার। কাজেই যে কোনো বিষয়ে আমি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাকে আমার কওমের সাথে পরামর্শ করতে হবে। তাই আজ আসি। পরামর্শ করে পরে আপনাকে সিদ্ধান্ত জানান।’ এই বলে সেদিনের মতো আমার মুসআবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন।

আমর ফিরে এসে মুনাফ মূর্তির মন্দিরে ঢুকলেন। মুনাফকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘হে মুনাফ! এক ব্যক্তি তোমায় ভেঙ্গে ফেলতে চায়। তুমি নিশ্চয়ই তার আগমন সম্পর্কে অবগত। তার বিষয়ে তোমার বক্তব্য কী?’ যখন মূর্তি থেকে কোনো সাড়া মিলল না তখন অনুযোগের সুরে বললেন, ‘মুনাফ! হয়ত তুমি ঐ লোকের কাছে আমি গিয়েছিলাম বলে আমার প্রতি আজ রাগ করে আছ! ঠিক আছে, আমি তোমাকে আগামী কাল পর্যন্ত সময় দিলাম। কাল না হয় তোমার সিদ্ধান্ত জানিয়ো।’

রাত গভীর হলে আমার সন্তানরা মুনাফের মন্দিরে প্রবেশ করল। তারপর মূর্তিটিকে সেখান থেকে সরিয়ে বাড়ির পেছনের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করল। সকাল বেলা পিতার ঘুম ভাঙলে আড়মোড়া ভেঙ্গে মুনাফের ঘরে গেলেন। কিন্তু একি! কোথায় মুনাফ? কোথায় আমার রব? মুনাফকে না পেয়ে আমার সবার কাছে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ছেলেরা জবাব দিলেন, আমরা জানি না।

কারো কাছে খোঁজ না পেয়ে আমার নিজেই বাড়ির আশপাশে অনুসন্ধানের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির পেছনে ময়লার স্তূপে তাকে পড়ে থাকতে দেখে বললেন, ‘তুমি নিজেকে মানুষের অনর্থ থেকে বাঁচাতে পার না আর আমি তোমার কাছে চাই যে, তুমি আমাকে রোগমুক্তি দিবে। আমার ঋণ পরিশোধ করবে। আমাদের হারানো ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দিবে।’ এভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক কথা বলে রাগ ঝাড়ার পর তিনি মূর্তিটিকে উঠিয়ে

গোসল করালেন। তারপর তাকে সুগন্ধি মেখে আবার ঘরে এনে প্রতিস্থাপন করে বললেন, ‘হয়ত আজ তুমি ভীষণ রাগ করেছ। কারণ কিছু লোক তোমাকে অপদস্থ করেছে। তাই আজও তোমাকে সময় দিলাম। আগামীকাল সিদ্ধান্ত জানিয়ো।’

রাতে তিনি একটি তরবারী এনে মূর্তির উপর ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, ‘হে মুনাফ! ছাগলও তার নিতম্বকে রক্ষা করে থাকে। সুতরাং তোমার ব্যাপারে আমি আর কী বলব? এই তরবারী রেখে গেলাম। এর মাধ্যমে তুমি নিজেকে রক্ষা কর।’

রাত গভীর হলে সেদিনও তার সন্তানরা মন্দিরে ঢুকে তরবারী নামিয়ে মূর্তিটিকে মৃত কুকুরের সাথে বেঁধে একটি পরিত্যক্ত কুয়ায় ফেলে দিলেন। সকাল বেলা আমরা তার মূর্তির অনুসন্ধান করে না পেয়ে সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, কে আমাদের প্রভুর সাথে শত্রুতা শুরু করেছে? তারা বললেন, আমরা জানি না।

এরপর খুঁজতে খুঁজতে কুয়ার কাছে এসে তার মাবুদকে মরা কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলতে লাগলেন, ‘হায় আমার রব! শিয়ালও তোমার মাথায় পেশাব করে! যার মাথায় শিয়াল পেশাব করতে পারে সে তো ব্যর্থ, অকৃতকার্য।’ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহর কসম! তুমি যদি বাস্তবেই ইলাহ হতে তাহলে কুয়ার মাঝে কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে না।’

এরপর তিনি মুসআব বিন উমায়ের রাযি.এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে বীরত্বের সাথে ইসলামের বিভিন্ন জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। শিরক থেকে তওবা করে ঈমানের পথে প্রত্যাবর্তন ছিল তার জীবনের একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা তার জীবনকে আমূলে পাণ্টে দিয়েছিল। এবার সেই ইতিহাস শুনুন!

বদরের যুদ্ধে আমাদের সন্তানরা তাঁকে বার্ষিক্য ও তাঁর পায়ে সমস্যার অযুহাতে অনেক বুঝিয়ে গুনিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখলেন। এরপর যখন অহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষিত তৈরি হল, এবারও ছেলেরা তাঁকে বারণ করলে তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে বাধা দিচ্ছে। আপনি এর বিহিত করুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর খোড়া পা, বার্বক্য ও বয়সের ভারে নুয়ে পড়া পিঠ দেখে বললেন, ‘হে আমার! আল্লাহ তাআলা তো আপনার মায়ুরী গ্রহণ করবেন।’

আমর জবাব দিলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার এ খোড়া পা নিয়েই জান্নাতে হাঁটতে চাই।’ জিহাদের প্রতি তাঁর আবেগ ও উচ্ছাস লক্ষ্য করে শেষাবধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু জিহাদের দিন যতই ঘণিয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে তার পায়ের সমস্যা বেড়েই চলছে। নিদারুণ ব্যথায় ক্রমেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তারপরও তিনি দমবার পাত্র নন। জিহাদে অংশগ্রহণের অদম্য স্পৃহায় তিনি উজ্জীবিত।

মুসলিম কাফেলা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে ছাউনী ফেলল। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। আমর ইবনে জুমুহ তরবারী চালাতে চালাতে কাফির সৈন্যবাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লেন। কাফিরদের সাথে বীর বিক্রমে লড়াই করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে দুশমনের তীর ও তরবারীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শহিদদের কাফেলায় शामिल হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাঁকে দাফন করলেন।

শাহাদাতের ছেচল্লিশ বছর পর এক প্রবল বন্যার পানির বান উল্হদের শহীদের কবরস্থানে আঘাত হানল। পানির প্রবল শ্রোতের কারণে কবরের মাটি সরে যাওয়ার উপক্রম হলে তৎকালীন মুসলমানরা শহিদদের দেহগুলো স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমর ইবনে জুমুহের কবর খনন করা হলে তাঁর লাশ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। অক্ষত দেহ; ঠিক যেমন দাফন করা হয়েছিল তেমনি আছে। মাটি তাঁর দেহের সামান্যও ক্ষতি করেনি।

ভাবুন! সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তা গ্রহণ করে নেয়ার কারণে, তাওহীদের কালেমাকে মেনে নেয়ার কারণে কিভাবে আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার জন্য এমন শুভ পরিণামের ফয়সালা করলেন! দুনিয়াতেই তার মর্যাদার কিছুটা নমুনা ও ঝলক দেখিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, এই কালেমার কারণেই আসমান-যমীন দাঁড়িয়ে আছে। এর জন্যই সমস্ত মাখলুককে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কালেমাই জান্নাতে প্রবেশের সোপান। এর জন্যই জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টি। এর কারণেই মানুষ মুমিন-কাফির, নেককার ও বদকার দু'ভাগে বিভক্ত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর পর সকলকে দু'টি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা হবে। এক, কার ইবাদত করতে? দুই, রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?

মুক্তির পথ

হাশরের দিন তাওহীদ নিশ্চিত না করতে পারার কারণে বহু মানুষকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে। ওরা লানতের উপযুক্ত হবে। কারণ আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রব। বান্দা কেবল তাঁর ওপরই ভরসা করতে পারে। তাঁর কাছেই আশা করতে পারে। কেবল তাঁর নামেই সে কসম খেতে পারে। কেবল তাঁর জন্যই মান্নত করতে পারে। কালেমায়ে শাহাদাত তথা তাওহীদের প্রমাণের পথ এটাই। যে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত মুআজের রা. প্রতি লক্ষ্য করুন! সব সময় যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছুপিছু হাঁটতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুআজ! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার হক কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? মুআজ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, যে বান্দা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না।'

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বড় গোনাহ

কোনটি? তিনি বললেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, কাউকে তার সমকক্ষ সাব্যস্ত করাই সবচেয়ে বড় গোনাহ।

তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্যই রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,-

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করেছিল; ফলে আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; যদ্বারণ ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি আসল এমন দিক হতে যা ছিল ধারণাতীত। [সূরা নাহল- ২৬]

আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছুই ইবাদত করা হয়, হোক তা কোনো মূর্তি বা কবর; সবই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। তাগুতের পথ তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। রাসূলগণের দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাওহীদ। মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করাই ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব। ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.

অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ স্থির করেছিলাম যাদের ইবাদত করা যায়? [সূরা যুখরুফ- ৪৫]

সমস্ত আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে তাওহীদের ওপর। তাওহীদ নিশ্চিত করতে পারলেই মুক্তি। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি যমীন সমান গোনাহের পাত্র নিয়ে আমার কাছে আস, কিন্তু তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করনি, তাহলে আমিও তোমার কাছে যমীন সমান ক্ষমার পাত্র নিয়ে আসব।’ [সুনানে তিরমিযী- ৩৫৪০]

তাওহীদ অত্যন্ত নায়ুক ও স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ার কারণে নবীগণ পর্যন্ত এ বিষয়ে শঙ্কিত থাকতেন। মূর্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে যিনি তাওহীদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলেন, বাইতুল্লাহর নির্মাতা সেই ইবরাহীম আ.ও মহামহিম আল্লাহ তাআলার দরবারে কেঁদেকেটে ফরিয়াদ করতেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ.

অর্থাৎ আর স্মরণ কর! যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখুন। [সূরা ইবরাহীম- ৩৫]

যেভাবে হয়েছিল বিকৃতির সূচনা

পৃথিবীর বুকে সর্ব প্রথম শিরকের উৎপত্তি ঘটে নুহ সম্প্রদায়ের মাঝে। তাদের মাঝে শিরক ছড়িয়ে পড়ার পর আল্লাহ তাআলা হযরত নুহ আ.কে তাদের কাছে নবী বানিয়ে পাঠান। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে শিরক থেকে বারণ করেন। যারা তাঁর কথা মেনে নিল এবং তাওহীদকে গ্রহণ করল তারা মুক্তি পেল। আর যারা শিরকের ওপরই অটল রইল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন।

এরপর দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে কেবল তাওহীদই বিদ্যমান ছিল। দীর্ঘ বিরতির পর শয়তান আবার সঙ্গোপনে সক্রিয় হল। শয়তানের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও অবিরাম চেষ্টায় পৃথিবীতে আবারো শিরক জেঁকে বসল।

মানুষকে শিরক থেকে নিবৃত্ত করতে আল্লাহ তাআলাও যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠানো অব্যাহত রাখলেন। সর্বশেষ খাতিমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় পৃথিবী থেকে শিরক বিদায় নিতে শুরু করল। সকলে তাওহীদের প্রতি ধাবিত হতে লাগল। কিন্তু কিছু মানুষের অলী ও বুয়ুর্গানে দ্বীনের প্রতি অতি ভক্তির কারণে তাওহীদে

বিশ্বাসী মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝেই আবার শিরকের সূত্রপাত ঘটল। কবরের উপর মাযার নির্মাণ, মাযারে গিয়ে দুআ করা, মাযারের নামে মান্নত করার মাধ্যমে তারাও শিরকে জড়িয়ে পড়ল। তারা একে ‘বুয়ুর্গদের উসীলা’ গ্রহণ হিসেবে অভিহিত করতে শুরু করল। তারা মনে করল, মাযারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য অর্জন করেছে। অথচ তারা ভুলে গেল, পূর্ববর্তী মুশরিকরাও মূর্তিপূজার সূচনালগ্নে একই যুক্তি পেশ করেছিল।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

অর্থাৎ জেনে রেখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন। [সূরা যুমার- ৩]

আবু জাহেল, আবু লাহাবরাও বিশ্বাস করত, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ইলাহ। তিনিই স্রষ্টা। কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করত। তারাও মনে করত, মূর্তিরা তাদের আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনে উসীলা হবে। তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে।

নবীযুগে তাওহীদ ও শিরকের স্বরূপ এবং সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি

সুনানে বায়হাকী ও হাদীসের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মানুষের মাঝে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন মক্কার কাফিররা সাধারণ মানুষকে তাঁর দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত করতে ষড়যন্ত্র করল। তারা তাঁকে জাদুকর, জ্যোতিষ ও পাগল বলে আখ্যায়িত করল। কিন্তু দিন দিন তাঁর অনুগতদের সংখ্যা বেড়েই চললে

তারা সিদ্ধান্ত নিল, যে করেই হোক তাঁকে বাধাহীন করতে হবে। প্রয়োজনে মুহাম্মাদকে দুনিয়া ও সম্পদের মোহে ফেলতে হবে।

পরিকল্পনা মোতাবেক কাফির সর্দার হুসাইন ইবনে মুনযির খুযায়ীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঠাল। হুসাইন তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাদের একতাকে বিভক্ত করেছ। আমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করেছ। তোমার পরিকল্পনা কী? তুমি কি সম্পদ চাও? তাহলে বল! আমরা তোমাকে সম্পদ দিব। তুমি কি সুন্দরী রমণী চাও? তাহলে বল! আমরা তোমাকে সুন্দরী রমণী বিয়ে করাব। নাকি তুমি রাজত্ব চাও? তাহলে আমরা তোমাকে রাজত্বও দিব।'

এভাবে বিভিন্ন প্রস্তাবের কথা বলে হুসাইন তাঁকে উৎসাহিত ও প্রবঞ্চিত করতে চাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবে তার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, আবু ইমরান!(হুসাইনের উপনাম) তোমার কথা কি শেষ? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কয়জন ইলাহের ইবাদত কর? সে বলল, সাতজন ইলাহের। ছয়জন যমীনের, একজন আসমানের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্পদ যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন কাকে ডাক? বলল, আসমানের ইলাহকে ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে কাকে ডাক? বলল, আসমানের ইলাহকে ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরিবার ক্ষুধার্ত হলে কাকে ডাক? বলল, আসমানের ইলাহকে ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় কি একজন নাকি সকলে? সে জবাব দিল, সকলে না। একজনই সাড়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার ডাকে সাড়া দেয় একজন। তোমায় নিয়ামত দেয় একজন, অথচ তুমি তার সাথে অন্যদের শরীক করছ?! নাকি তুমি আশঙ্কা কর যে, ওরা সেই এক ইলাহকে পরাজিত করে ফেলতে পারে? সেই ভয়েই কি ওদের পূজা কর?' হুসাইন বলল, তারা সবাই মিলেও তা পারবে না। আসমানের ইলাহ তাদের সকলের ক্ষমতার উর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হুসাইন! তুমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেল। আমি তোমাকে এমন কিছু দুআ শিখাব, যদ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমার প্রভূত কল্যাণ সাধন করবেন।

কথিত আছে, হুসাইন তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কথামত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু দুআ শিক্ষা দেন যার মাধ্যমে তিনি সবসময় দুআ করতেন।

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে বিবৃত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মদীনার আশপাশে টহল দেওয়ার জন্য নিয়মিতই ঘোড়া সাওয়ার পাঠাতেন। তারা মদীনার আশপাশ ঘুরে দেখতেন। একদিন এমনই এক ঘোড়া সাওয়ার দল এক ব্যক্তিকে ইহরাম বেঁধে মদীনার পাশ দিয়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে চলে যেতে দেখলেন। ঐ ব্যক্তি তালবিয়া বিকৃত করে পড়ছিল। তার তালবিয়ার অর্থ ছিল এমন, তোমার কোন শরীক নেই তবে একজন আছে, তার ও তার মালিকানাধীন সব কিছুর মালিকও অবশ্য তুমিই। শেষ বাক্যটি সে বার বার বলছিল। সাহাবায়ে কেরাম তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? কোথায় যাও? তিনি জবাব দিলেন, মক্কায় যাই; ওমরা করতে। সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন, এতো মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের এলাকার লোক! তারা তাকে শত্রুর চর মনে করে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সামনে পেশ করার জন্য মসজিদে নববীর খুটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এসে নামায পড়ে বন্দীর দিকে তাকালেন। সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান, তোমরা কাকে আটক করেছ? তারা বললেন, কাকে? তিনি জবাব দিলেন, 'বনু হানিফার সর্দার সুমামা ইবনে আসালকে। সে নজদের সমস্ত গোত্রের সর্দার। গম, জবসহ মক্কায় যত প্রকার খাদ্য আসে; সব তার অধীনেই আসে। তাকে বেঁধে রাখ এবং তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে থাক।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে এসে সুমামার জন্য খাবার-পানীয় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

ওদিকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বন্দীকে মসজিদে নিয়ে বেঁধে রেখেছেন। পরবর্তী নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে বললেন, সুমামা! তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তিনি জবাব দিলেন, না। এ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

তাহলে তোমার কী মত? তিনি দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, আপনি আমাকে হত্যা করলে রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হবে, এমন ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন। আর অনুগ্রহ করলে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই করবেন। আর যদি আপনি সম্পদ চান, চাইতে পারেন। আমার জাতি আপনার পায়ে সম্পদের স্তূপ আছড়ে ফেলবে।

পরদিন তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আগের মতোই জিজ্ঞেস করলেন, কী মত তোমার? সুমামাও আগের মতোই উত্তর দিলেন, আপনি আমাকে হত্যা করলে রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হবে, এমন ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন। আর অনুগ্রহ করলে শোকরগুয়ার ব্যক্তিকেই করবেন। আর যদি আপনি সম্পদ চান, চাইতে পারেন। আমার জাতি আপনার পায়ে সম্পদের স্তূপ আছড়ে ফেলবে।

সুমামার জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন। এদিকে সুমামা সাহাবায়ে কেরামকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলেন। তিনি গভীরভাবে তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সাথে তাদের আচরণ দেখলেন। দেখলেন, তাদের কেউ নামায পড়ছেন। কেউ কান্নাকাটি করছেন। কেউবা কুরআন তিলাওয়াত করছেন। সুমামা এসব দৃশ্য দেখে প্রভাবিত হচ্ছিলেন। পরদিন রাসূলুল্লাহ তাকে একই প্রশ্ন করলে সুমামা জবাব দিলেন, আমার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন সুমামার ইসলাম গ্রহণের সব দুয়ারই বন্ধ, তার ইসলাম গ্রহণের কোনো আশাই আর বাকী নেই তখন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও।

নির্দেশ হতেই সাহাবায়ে কেরাম তাকে ছেড়ে দিলেন এবং নির্দেশানুসারে তাকে তার সওয়ারী দিয়ে বিদায় জানালেন।

সুমামা মসজিদে নববী থেকে বের হয়ে স্বীয় ধর্ম সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন, এটা কেমন ধর্ম? শক্তিহীন, নিষ্ঠ্রাণ পাথরের পূজা! যার কোনো ক্ষমতা নেই, শক্তি নেই তাকে ইলাহ বলে ভাবা! না এ হতে পারে না।

তিনি করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। মসজিদে নববীর নিকটস্থ এক পানির ঘাটের কাছে গিয়ে গোসল করে পুনরায় তার ইহরামের কাপড় পরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে ফিরে এলেন। এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

ইসলাম গ্রহণের পর সুমামা বলেন, আল্লাহর কসম! ত্রিভুবনে আমার কাছে আপনার চেহারার চেয়ে অপবিত্র কোনো চেহারা ছিল না। এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সব চেয়ে পবিত্র চেহারা হয়ে গেছে। আপনার নগরীর চেয়ে অপ্রিয় কোনো নগরী ছিল না। এখন এটাই আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় নগরী হয়ে গেছে। আপনার দ্বীনের চেয়ে অপছন্দনীয় কোনো দ্বীন ছিল না। এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় দ্বীন। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার যা খুশি আমাকে আদেশ করুন। আমি এখন ইহরাম অবস্থায় আছি। ওমরা করার ইচ্ছায় বের হয়েছিলাম। এমতাবস্থায় আপনার বাহিনী আমায় আটক করেন। এখন আমার কী করণীয়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উমরা পূর্ণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিয়ে মক্কায় গিয়ে ওমরা করতে বললেন। সে মোতাবেক সুমামা মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। এবার তার তালবিয়া পালেট গেল। এবার তিনি তাওহীদের তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, তাঁর কোনো শরীক নেই। না তাঁর সাথে কোনো দরগার ইবাদত করা হবে। না কোনো মূর্তির জন্য নামায বা সিজদা করা হবে।

সুমামা মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুরাইশের সর্দাররা তাকে দেখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু তার ইসলামের তালবিয়া শুনে তারা মন্তব্য করল, এতো গুনছি নতুন তালবিয়া! জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তোমার নিজের ও বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ? সুমামা বললেন, হ্যাঁ। আমি সাক্ষ্য দিই, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।

এতদশবণে কাফিররা তাকে মারতে উদ্ধত হলে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করলেন, খবরদার! আল্লাহর কসম! এখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর অনুমতি ছাড়া যামামা থেকে তোমাদের কাছে একটি গম বা যবের দানাও পৌঁছবে না।

এখানে লক্ষ্য করুন! প্রথমে সুমামা কিভাবে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে সম্মান জানাচ্ছিলেন! এ সম্মান জানানোর কারণেই তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এ জন্যই তাকে মুশরিক হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাই তাওহীদ কেবল আল্লাহ তাআলাকে ইলাহ বলে স্বীকার করার নাম নয়, বরং পাশাপাশি গাইরুল্লাহকে অযাচিত সম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকাও তাওহীদের অপরিহার্য দাবী।

শিরকের ব্যাপারে শৈথিল্য!

কিছু মানুষ সমাজে বাড়তে থাকা বেশ্যাবৃত্তি, মদপান বেহায়াপনা দেখে খুব চিন্তিত, পেরেশান ও বিষন্ন হয়। কিন্তু কবর পূজা, মায়ার পূজা এসব দেখে তারা ততটা চিন্তিত বা পেরেশান হয় না। যদিও যিনা, মদপান কবীরা গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও তা কিন্তু একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। অথচ গাইরুল্লাহর সামান্য ইবাদত নিশ্চিতভাবে কুফরী। যা মানুষকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুর মতো ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। মানুষকে এর প্রতি সতর্ক ও গুরুত্বারোপ করেছেন।

একবার এক শায়েখ তাওহীদের গুরুত্ব সংক্রান্ত একটি কিতাব রচনা করলেন। ছাত্রদেরকে তার পাঠদান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও এ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল পাঠদান করাতে লাগলেন।

একদিন জনৈক ছাত্র বলল, শায়েখ! আমরা চাই আপনি পাঠে বৈচিত্র আনুন। চলমান বিষয়ের পরিবর্তে আমাদেরকে ইতিহাস, সীরাত, ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করুন। শায়েখ বললেন, ঠিক আছে। বিষয়টি আমি বিবেচনা করে দেখব। পরদিন শায়েখ অত্যন্ত পেরেশানী ও বিষন্নতা নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করলেন। ছাত্ররা তাঁর কাছে দুশ্চিন্তার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি বললেন, শুনলাম, পাশের গ্রামে একজন নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছেন। কিন্তু জিনদের উৎপাতে তিনি ভীত। তাই জিনদের মনোভুষ্টির জন্য তিনি বাড়ির দুয়ারে জিনদের নামে একটি মুরগী জবাই করেছেন। লোক পাঠিয়ে আমি ব্যাপারটি তদন্ত করে জেনেছি। শিক্ষকের কথা ও

ব্যথায় ছাত্রদের মাঝে তেমন প্রভাব পড়ল না। তারা লোকটির হিদায়াতের জন্য দুআ করে নীরব হয়ে গেল।

পরদিন শায়েখ ক্লাশে এসে জানালেন, গতরাতে জানতে পারলাম, ঘটনা আসলে তা নয় যা আমি শুনেছিলাম। সেখানে অন্য ঘটনা ঘটেছে। লোকটি জিনের জন্য কোনো মুরগী জবাই করেনি। সে তার মায়ের সাথে যিনা করেছে।

এ কথা বলতেই ছাত্ররা সব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা লোকটিকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগল। লোকটিকে ঘেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলল। তাদের মাঝে এটা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও হেঁচো শুরু হয়ে গেল।

শায়েখ সকলকে থামিয়ে বললেন, কী আশ্চর্য! তোমরা লোকটিকে এত তিরস্কার করছ এমন একটি কবীরা গুনাহের কারণে যদ্বরণ সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়নি। অথচ এক ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত, গাইরুল্লাহর জন্য সে মুরগী জবাই করেছে, গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদতমূলক কাজ করেছে, তাকে তোমরা তিরস্কার করছ না! আশ্চর্য তোমাদের অনুভূতি!

ছাত্ররা এবার নীরব হয়ে গেলে শায়েখ একজন ছাত্রকে বললেন, কিতাবুত তাওহীদ নিয়ে এস। এটাকে নতুনভাবে আবার শুরু থেকে পড়াতে হবে। কারণ শিরক সবচেয়ে বড় গোনাহ। আল্লাহ তাআলা কখনোই যে গোনাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেছেন-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

অর্থাৎ যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়। [সূরা লুকমান- ১৩]

জান্নাতকে তিনি শিরককারীদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন। তারা চিরকাল জাহান্নামেই অবস্থান করবে। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী হবে না। [সূরা মায়েরা-৭২]

দরগা ও দুর্গা পূজার মাঝে কোনো বিভাজন নেই

মুশরিকরাও তাদের অন্যান্য ইলাহের চেয়ে আল্লাহ তাআলাকে বেশি সম্মান করত। আল্লাহ তাআলাকেই তারা মহান রব হিসেবে বিশ্বাস করত। তারপরও তারা মুশরিক; এর কারণ কী?

আপনি আমাকে বলুন! আবু জাহেল, আবু লাহাবের শিরক আর তাদের শিরকের মাঝে কী পার্থক্য? যারা আজ মাযারের সমানে প্রাণী জবাই দেয়! যারা মাযারের সিঁড়িতে সিজদা করে বা মাযারকে তওয়াফ করে! কিংবা বুয়ুর্গদের সমাধি সৌধে গিয়ে অবনত মস্তকে বিনয়াবনত দাঁড়িয়ে থাকে! কিছু পঁচাগলা হাড্ডির কাছে রোগমুক্তি বা হারানো ব্যক্তির সন্ধান কামনা করে! তাদের সাথে মক্কার মুশরিকদের কী ব্যবধান? বর্তমানের দরগা ও দুর্গার সামনে যা কিছু করা হয় তার মাঝে কিসের বিভাজন?

আশ্চর্য হতে হয়! কিভাবে মানুষ এ সব কাজ করে, অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ডাক, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে। [সূরা আরাফ- ১৯৪]

আজ মাযার আর দরগাগুলোতে কবরওয়ালায় জন্য প্রাণী জবাই করে তার সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়ার নামে যা হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় গোনাহ। এমনকি এ গুলো মদপান ও যিনার চেয়েও মারাত্মক গোনাহ। আল্লাহ তাআলা বলছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে কেউ আল্লাহর অংশীদার স্থির করে, সে মহাপাপে জড়িয়ে মিথ্যা রচনা করল। [সূরা নিসা- ৪৮]

কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য, আল্লাহ তাআলা যিনার অপরাধ ক্ষমা করবেন। হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ ক্ষমা করবেন। কিন্তু শিরকের গোনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ শিরক সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

অর্থাৎ যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়। [সূরা লুকমান- ১৩]

মুশরিকদের জন্য জান্নাত চিরতরের জন্য হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী হবে না। [সূরা মায়েদা- ৭২]

যে ব্যক্তি শিরকে নিমজ্জিত হবে তার যাবতীয় আমল বেকার ও নিষ্ফল। তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ সবকিছু মূল্যহীন। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির কর তবে নিঃসন্দেহে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা যুমার- ৬৫]

বালক ও আখরোট পূজারীর গল্প

যারা মৃতদের কাছে দুআ করেন, সাহায্য প্রার্থনা করেন, আমি তাদের বলব আপনারা যাদের মাযারে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন, যাদের শাফাআতের আশা করছেন-

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. يَنْفَعُوكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ.

অর্থাৎ তিনি বললেন, তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে? অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে? [সূরা শুআরাঃ ৭২-৭৩]

তারা কি আপনাদের এসব প্রার্থনা, আহাজারী শুনতে পান? আল্লাহর কসম! তারা কখনোই তা শুনতে পান না। তারা কখনো আপনাদের কোনো উপকারও করতে পারবে না, বরং আপনাদের কর্মকাণ্ডে তারা লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

তের বছরের একজন বালক। তার পিতার সাথে হিন্দুস্তান সফরে গিয়েছিল। সে এক চমৎকার কাজ করেছিল। হিন্দুস্তান হচ্ছে এমন এক বিশাল আজব দেশ, যেখানে বহু ইলাহ বিদ্যমান। তারা সব কিছুই ইবাদত করে। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ, মানুষ কোনো কিছুই তাদের ইলাহ থেকে বাদ নেই। সেখানে সব কিছুর পূজা চলে।

বালক এক মন্দিরে প্রবেশ করল। সেখানে গিয়ে দেখল লোকেরা একটি আখরোট ফলের পূজা করছে। আখরোটের গায়ে চোখ, নাক, মুখ অঙ্কন করে তার সামনে বিভিন্ন খাদদ্রব্যের পসরা সাজিয়ে তার সামনে তারা বিনয়াবনত। যখন পূজারীরা সিজদায় গেল বালকটি এগিয়ে গিয়ে আখরোটটি হাতে নিয়ে দৌড়ে পালালো।

পূজারীরা যখন মাথা তুলল, দেখল তাদের ইলাহ নেই। চারদিক তাকিয়ে দেখল কেউ নেই। বুঝল, একটু আগে প্রবেশকারী বালকটিই নিশ্চয়ই এই কাজ করেছে। তারাও পূজা ছেড়ে বালকের পিছু ধাওয়া করল।

বালক বেশ দূরে গিয়ে এক জায়গায় বসে আখরোট ভেঙ্গে তার ভেতরের পানি খেয়ে সেটিকে ফেলে রাখল। পূজারীরা তাদের ইলাহকে ভাগা দেখতে পেয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। বালককে ধরে তারা বেদম প্রহার করল। তারপর তাকে নিয়ে নগর বিচারকের কাছে গেল।

বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি ইলাহকে ভেঙ্গেছ? বালক বলল, না। আমি তো আখরোট ভেঙ্গেছি। বিচারক বললেন, কিন্তু সে তো ওদের ইলাহ! বালক বলল, আপনি কি কখনো হিন্দুস্তানের আখরোট ভেঙ্গে খাননি? বিচারক বললেন, হ্যাঁ, খেয়েছি। বালক বলল, তাহলে আপনার ও আমার মাঝে পার্থক্য কী? বিচারক এবার খতমত খেয়ে গেলেন। কী জবাব দিবেন ভেবে পেলেন না। ওদিকে পূজারীরা বিচারকের জবাবের প্রতীক্ষায়। কিন্তু বিচারক হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। বিচারকের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দেখে এবার পূজারীরাই জবাব দিল, এই আখরোটের তো চোখ, মুখ আছে! বালকও চিৎকার করে বলল, তাই বলে কি ওটা কথা বলতে পারে? তারা বলল, না। বালক বলল, তাহলে শুনতে পারে? তারা বলল, না। বালক বলল, তাহলে তোমরা কেন তার ইবাদত কর? পূজারীরাও এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। বিচারক দেখলেন, পূজারীরা যে কোনো সময় বালকের উপর হামলে পড়তে পারে। তার কোনো ক্ষতি করে ফেলতে পারে। তাই তিনি তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত দিলেন, বালকের ওপর ১৫০ রুপিয়ার জরিমানা ধার্য করলেন। বালক বাধ্য হয়ে তা আদায় করে আদালত থেকে বেরিয়ে এল।

তাওহীদের পূণ্যভূমি আরব ভূখণ্ডের নাযুক অবস্থা

এবার একটি দুঃখজনক বাস্তব পরিসংখ্যান শুনুন। কেবল হিন্দুস্তান নয়, তাওহীদের পূণ্যভূমি এই আরব ভূমিতেও কী পরিমাণ শিরকের ছড়াছড়ি! মিসরে বিভিন্ন শহর ও গ্রামগঞ্জে বহু মাযার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেখানে মাযারে সংখ্যা ছয়শ'রও বেশি। এই মাযারগুলো সেখানকার ভক্ত-মুরীদদের

কেন্দ্র। বৎসরের এমন কোনো দিন পাওয়া কষ্টকর যেদিন মিসরের কোনো না কোনো অলীর জন্মদিন উপলক্ষে জন্মদিন ও উরশ উদযাপন হয় না। সেখানে যে গ্রাম মাযার শূন্য সেটাকে বিরানভূমি ও বরকত শূন্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ছোট-বড় কত রকমের যে মাযার সেখানে! মাযার যত বড় ও প্রশস্ত এবং তার জাকেরীনদের আওয়াজ যত উঁচু হয়, তার গ্রহণযোগ্যতা ততই বাড়ে। ভক্ত-আশেকানদের আনাগোনা সেখানে বৃদ্ধি পায়।

কায়রোর বড় বড় মাযারগুলোর মাঝে অন্যতম হচ্ছে, হযরত হুসাইনের মাযার, যয়নবের মাযার, আয়েশার মাযার, সকীনার মাযার, ইমাম শাফেয়ীর মাযার, লাইস ইবনে সাদের মাযার ইত্যাদি।

মাযারের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে সিরিয়া। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, সিরিয়ার কেবল দামেস্ক নগরীতেই প্রায় ১৯৪ টি মাযার রয়েছে। এর মধ্যে ৪৪ টি মাযার বেশ প্রসিদ্ধ। দামেস্ক নগরীর ২৭ টিরও অধিক মাযারকে বিভিন্ন সাহাবির বলে উল্লেখ করা হয়। সেখানে মসজিদে উমাইয়ার ভেতরে আছে ইয়াহয়া বিন যাকারিয়া আ.এর মাযার। মসজিদের পাশে আছে হযরত সালেহ আ., ইমাদুদ্দীন জঙ্গী, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীসহ অনেকের মাযার। দর্শনার্থীরা নিয়মিত সেগুলো যিয়ারত করে। সেগুলোর উসীলা প্রার্থনা করে।

তুরস্কে ৪৮১ টিরও অধিক জামেয়া রয়েছে যে জামেয়াগুলোর কোনোটিই বোধ হয় মাযারমুক্ত নয়। সেখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাযার হচ্ছে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.এর মাযার। যা ইস্তাম্বুলে অবস্থিত।

হিন্দুস্তানে ১৫০ টিরও বেশি মাযার পাওয়া যায়। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন সেগুলো যিয়ারত করতে এসে নিজের ঈমান, আমল সব ধ্বংস করে থাকে।

ইরাকের কেবল বাগদাদ নগরীতেই ১৫০ টি জামেয়া রয়েছে, যার প্রায় সবক'টিতেই মাযার রয়েছে। মুসেলে ৭৬ টি মাযার রয়েছে। এর সবগুলো বিভিন্ন প্রসিদ্ধ জামেয়ার ভিতরে। আর মসজিদ সংশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন মাযারের সংখ্যা এর বাইরে।

হিন্দুস্তানে শায়েখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর কবর এখন মাযারে পরিণত হয়েছে। সেখানে সিজদা, মান্নতসহ আরো বহুরকম ইবাদত করা হয়ে থাকে। পাকিস্তানের লাহোরে শায়েখ আলী হাজুরীর মাযার তো বেশ প্রসিদ্ধ।

বিস্ময়কর হচ্ছে, মানুষ এ সব মাযারের প্রতি এতই আসক্ত যে, এ সব মাযারের অধিকাংশই মিথ্যাসর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো পরোয়া নেই। বিকারমস্তের মতো তারা এসবের পূজা-ইবাদত করে যাচ্ছে। যেমন হুসাইন রাযি.এর একটি মাযার আছে কায়রোতে। সেখানে প্রতিনিয়ত বহুরকম শিরকী কর্মকাণ্ড হচ্ছে। আবার আসকালানেও তাঁর আরেকটি মাযার আছে। সেটাকেও মানুষ ঘিয়ারত করছে। আবার হালবের পশ্চিমে জিগুন পাহাড়ের পাদদেশে হুসাইন রাযি.এর মাথার মাযার রয়েছে। আরও চার জায়গায় হুসাইন রাযি.এর মাথা রয়েছে বলে সেখানে মাযার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দামেস্ক, মদীনায় হযরত ফাতেমার কবরের পাশে, নজফে আলী রাযি.এর কথিত মাযারের সাথে এবং আরেকটি কারবালায়।

হযরত যয়নব বিনতে আলী রাযি. মদীনায় ইন্তেকাল করেছেন। জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাহিত হয়েছেন। অথচ শিয়ারা দামেস্কে তাঁর মাযার বানিয়েছে। মিসরেও তাঁর একাধিক মাযার রয়েছে। অথচ ইতিহাসের কোথাও তিনি জীবিত বা মৃত অবস্থায় মিসরে এসেছিলেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ইস্কানদারবাসী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, হযরত আবু দারদা রাযি. ইস্কান্দারে সমাহিত হয়েছেন, যেখানে আজ তাঁর মাযার রয়েছে। অথচ ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত যে, তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেননি।

একই ঘটনা ঘটেছে হযরত যয়নব বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর ক্ষেত্রে। জনৈক ফাতেমী খলীফা তার মাযার বানিয়েছিলেন। হযরত হুসাইন কন্যা সকীনার বেলাতেও এমনই ঘটেছে। তদ্রূপ ইরাকের নজফ শহরে আলী রাযি.এর মাযারটিও বানোয়াট। কারণ তিনি সমাহিত হন কুফায়।

মিথ্যা মাযারগুলোর তালিকায় আরো আছে বসরায় আব্দুর রাহমান বিন আউফের কবর। যিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করে জান্নাতুল বাকীতে কবরস্থ

হন। হলেবে জাবের বিন আব্দুল্লাহর কবর। অথচ তিনি মদীনায়ে ইন্তোকাল করেন। তদ্রূপ সিরিয়ায় অবস্থিত উম্মে কুলসুম ও রুকাইয়ার কবর। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর জীবদ্দশায় মদীনায়ে ইন্তোকাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাদেরকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেন। দামেস্কের জামে মসজিদে অবস্থিত হুদ আ.এর কবরটিও তাই। কারণ তিনি কখনো সিরিয়াতেই আসেননি। তাঁর আরেকটি কবর আবার হায়রামাওতেও রয়েছে। সেখানে হযরত সালেহ আ.এরও কথিত মাযার রয়েছে। অথচ তিনি হিজ্রায়ে ইন্তোকাল করেন। তাঁর একটি কবর আবার ফিলিস্তিনের রাফাতেও রয়েছে। যেখানে আবার হযরত আইয়ুব আ. এরও কথিত কবর রয়েছে।

মাযারীদের কিছু প্রশ্নের জবাব

প্রথম প্রশ্ন : কবর সংশ্লিষ্টরা অনেক সময় আমাদের বলেন, তোমরা আমাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছ। কারণ আমরা মৃতদের ইবাদত করি না। এই আল্লাহর অলীগণ আল্লাহর কাছে অনেক মর্যাদা রাখেন। তারা আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবেন, সে জন্যই আমরা তাদের সান্নিধ্য কামনা ও হাসিল করি। এটাতো শিরক নয়।

উত্তরে আমরা বলব, মক্কার কাফিররা তাদের মূর্তিপূজার ক্ষেত্রেও এই কথাই বলত। তারাও আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারাও বিশ্বাস করত সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, সর্বময় ক্ষমতা কেবলই আল্লাহর। তাঁর কোনো শরীক নেই। কুরআনে তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.

অর্থাৎ তুমি বল! কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিযিক পৌছিয়ে থাকেন? অথবা কে কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর কে জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের

করেন? আর কে সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? অবশ্যই তারা বলবে যে আল্লাহ; অতএব, তুমি বল! তবে কেন তোমরা ভয় কর না? [সূরা ইউনুস-৩১]

তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল মনে করেছেন। কারণ তারা তাদের সকল ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই করত না।

পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো জন্য কোনো রকমের ইবাদতই করা যাবে না। শিরক হচ্ছে, বান্দা আল্লাহর ইবাদতে কাউকে তার শরীক বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। চাই সমকক্ষ কোনো মূর্তি বা পাথরকে করা হোক কিংবা কোনো নবী বা অলী বা তাদের কবরকে করা হোক। সবই শিরকের মাঝে शामिल। আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত; এমন কোনো আমল গাইরুল্লাহর জন্য করা হলে তা শিরকের মাঝে গণ্য। যে নামে যার জন্যই তা করা হোক; গাইরুল্লাহর জন্য এমন কাজ করার কোনো অবকাশ নেই।

মনে করুন! আজ যদি আমাদের মুসলমানদের মাঝে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যারা আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান আছে বলে দাবী উঠায়, তাহলে তাদের হুকুম কী হবে? যদিও তারা নিজেদেরকে খৃষ্টান নয়, মুসলমান বলেই পরিচয় দিবে, তারপরও তাদের হুকুম তো তাই হবে যা খৃষ্টানদের হুকুম। তাদের ক্ষেত্রে কুরআনের সেই আয়াতগুলোই প্রযোজ্য হবে যা খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে। তদ্রূপ মাযারপূজারীরা যদিও নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তারা আসলে মুসলমান নয়, কুরআন ও রাসূলের সুন্যাহর দৃষ্টিতে তারা মুশরিক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : কখনো তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা অলী-আওলিয়ার সান্নিধ্য কামনা করি, তাদের সুপারিশ পাওয়ার জন্য। তারা বুয়ুর্গ মানুষ ছিলেন। দিনভর রোযা রাখতেন। রাতভর কান্নাকাটি করতেন। ফলে স্বভাবতই আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সে হিসেবে তাদের জন্য মান্নাত করলে-প্রাণী জবাই ইত্যাদি করলে আমাদের প্রত্যাশা, তারা আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবেন।

উত্তরে আমরা বলব, দেখুন! আপনাদের সাথে আমরা সহমত যে, আল্লাহ তাআলা নবী ও অলীদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করবেন। নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের রব আমাদেরকে তাদের কাছে দূআ করতে, তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

আম্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরাম, শুহাদায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করতে পারবেন, ঠিক আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অধিকার থাকবে না। যারতাবর জন্য তারা সুপারিশ করতে পারবেন না, বরং যে সমস্ত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তোষ থাকবে, আল্লাহ তাআলা কেবল তাদের জন্যই তাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। কাজেই আল্লাহর নাফরমানী করে, কুরআন ও সুন্নাহর জীবনকে বাদ দিয়ে কেবল অলীআল্লাহদের সুপারিশের বদৌলতে আল্লাহকে পাওয়া ও জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন কখনোই পূরণ হওয়ার নয়।

তৃতীয় প্রশ্ন : অনেকে বলেন, যুগে যুগে বহু মুসলমানই তো কবর-মাযার এসবের সাথে জড়িত। মাযার নির্মাণ, উরস পালন এ সব তো নতুন কিছু নয়। যারা এ সব করছেন, তাদের মাঝে অনেক আলেম-উলামাও রয়েছেন। তাহলে কি তারা সকলেই ভুল করছেন? আর আপনারাই কেবল সঠিক পথে আছেন?

উত্তরে আমরা বলব, একে তো এ সব মাযারের অধিকাংশই মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবে ঐ সকল অলীদের কবর সেখানে সমাহিতই হয়নি। তাছাড়া এসব কর্মকাণ্ড যারাই করুন আর যত মানুষই করুন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর হাদীস ও সুন্নাহ আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন, ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান মসজিদরূপে গ্রহণ করেছে। [বুখারী, মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এহেন কর্ম থেকে আমাদের সতর্ক করেছেন। কাজেই ব্যক্তি বিশেষকে যতই জ্ঞানী মনে করা হোক না কেন, তাদের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, তাদের ভিন্নমত বা পথ গ্রহণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যের বিপরীতে দলীল হতে পারে না।

চতুর্থ প্রশ্ন : এখানে কারো মনে এ সন্দেহ জাগতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কবরই তো মসজিদের ভিতরে। তাহলে ‘নবীদের কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ কারা হয়েছে’ এ সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা এই কাজ যদি হারাম হত, তাহলে তাঁকে কেন সেখানে দাফন করা হল। তদুপরি তাঁর উপর আবার গম্বুজও তৈরি করা হল?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, নবীগণের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, তাদের মৃত্যুর স্থানেই তাদের সমাহিত করা। সে মোতাবেক ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.এর কামরায় সমাহিত করা হয়। সে সময় ওই জায়গা মসজিদের অংশ ছিল না। ফলে তাঁকে মূলত মসজিদে দাফন করা হয়নি। এটা হচ্ছে প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয়ত, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশার কামরায় সমাহিত করেছিলেন যেন তাঁর কবর ঘিরে সিজদা বা মসজিদ হওয়ার সুযোগ না থাকে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে মৃত্যুশয্যায় থাকাবস্থাতেই হুশিয়ারীও করেছিলেন। তাঁর হুশিয়ারী না থাকলে তাঁর কবর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানেই করা হত। মসজিদ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। যাই হোক, সাহাবায়ে কেরামের যমানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কবর মূলত আয়েশার ঘরের অভ্যন্তরে ছিল। আর আয়েশার ঘর ছিল মসজিদের পূর্বদিকে সংযুক্ত।

এভাবেই সব কিছু চলছিল। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাদের সময়কালে মসজিদে নববী সংস্কার ও সবদিক থেকে প্রশস্ত করেছেন। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যে পাশে ছিল সে দিক থেকে মসজিদকে সম্প্রসারিত করেননি। এছাড়া উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম সব দিক থেকেই মসজিদে নববীকে তারা সম্প্রসারিত করেছিলেন।

ক্রমান্বয়ে সাহাবায়ে কেরাম যখন প্রায় সকলেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের ৭৭ বছর খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক ঐ দিকসহ সবদিক থেকে মসজিদে নববীকে সম্প্রসারিত করার নির্দেশ দেন এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের কামরাগুলোকেও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ জারী করেন। ঐ সময়ই

মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কবর মসজিদে নববীর ভিতরে চলে যায়। এই হচ্ছে কবর ও মসজিদের ঘটনা।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের যমানার পর বা ক্রান্তিলগ্নে বাদশাহরা যা করেছেন, তার ভিত্তিতে মসজিদে কবর বানানোর বৈধতার দলীল পেশ করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। কারণ তা হাদীস ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.এর দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট বিপরীত ও লঙ্ঘন। এহেন কাজ করে খলীফা ওয়ালিদ নিঃসন্দেহে ভুল ও অপরাধ করেছিলেন। কারণ কবরকে মসজিদ বানাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করে গেছেন। উচিত ছিল তাঁর কবর যদিকে ছিল সেদিক বাদ দিয়ে অন্যান্য দিক থেকে মসজিদকে প্রশস্ত করা। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার কামরা তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের দিকে হাত বাড়ানো তৎকালীন খলীফার মারাত্মক ভুল হয়েছে। তদ্রূপ তাঁর কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণও অপরাধ হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তৎপরবর্তী সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ী কেউ সমর্থন করেননি। উম্মতের উলামায়ে কেরাম কিংবা কোনো ইমামও এর স্বপক্ষে বলেননি। এটা বহু পরে মিসরের বাদশাহ কালাউন সালেহী নির্মাণ করেন, যিনি মালিক মানসুর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন (মৃত : ৬৭৮ হিজরী)।

শিরকের বিভিন্ন রূপ ও কবর যিয়ারতের মাকসাদ

শিরকের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। কোনো কোনো শিরক একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তওবা করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে তাকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা বানিয়ে দেয়। যেমন গাইরুল্লাহর কাছে দুআ করা বা কোনো কিছু প্রার্থনা করা, কবর-মাযারে গাইরুল্লাহর জন্য মানত করা, প্রাণী জবাই করা, মৃত ব্যক্তি বা জিন-শয়তান কোনো ক্ষতি বা রোগবালা দিতে পারে মর্মে আশঙ্কা করা, আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ক্ষমতা যেমন বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদিকে গাইরুল্লাহর ক্ষমতাবীন সাব্যস্ত করা এ সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এ জাতীয় কাজই আজ মাযার ও দরগায় আগমনের ক্ষেত্রে মানুষের মূল উদ্দেশ্য।

শরীয়তে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজে উপদেশ গ্রহণ করা এবং মৃতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ এটা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দিবে।'

কিন্তু এখন মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করার পরিবর্তে খোদ মৃত ব্যক্তির কাছেই দুআ করা হয়। মৃতকে ডাকার জন্য কবর যিয়ারত করা, মৃতের কাছে নিজের হাজত পূরণের জন্য দুআ করা মস্তবড় শিরক। মৃত ব্যক্তি নবী বা অলী যিনিই হোন না কেন, তার কাছে দুআ করা শিরক। কারণ তারা মানুষ। তারা কারো ক্ষতি বা উপকার করতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ.

অর্থাৎ তুমি বলে দাও, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোনো অধিকার নেই, আমি যদি ইলমে গায়েব জানতাম তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতাম আর কোনো অমঙ্গল ও অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। [সূরা আরাফ- ১৮৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর রওযায় কিংবা হযরত হুসাইন, বাদাবী বা জিলানীর মাযারে যে দুআ ও সাহায্য চাওয়ার রেওয়াজ আছে; সে গুলোও শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত।

আর কবরস্থানে গিয়ে নামায পড়া বা সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা বিদআত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মাযারের খাদেমরাই বাহ্যত মুত্তাকীর লেবাস পরে মাযারের কারামত সম্পর্কে মিথ্যা সব কল্পকাহিনী রচনা করে মানুষকে শিরকের প্রতি আহ্বান করে। কেবল তাই নয়, মাযারকে সুন্দর করে সাজাতে ও মাযার নির্মাণে তারা বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে সুসজ্জিত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি হযরত আলী রাযি.কে তিনি

বলেছিলেন, হে আলী! কোনো প্রতিকৃতি পেলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। উঁচু কবর পেলে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে পাকা করতে, কবরে বসতে, তার উপর কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে এবং কবরে কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু যারা কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে, কবরে প্রদীপ জ্বালায়; তাদের তিনি লানত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা সেই জাতিকে লানত করেন যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে।’ ভাবা উচিত, নবীদের কবরের ব্যাপারেই যখন এমন হুশিয়ারী, তাহলে অন্যদের বেলায় কী হুকুম হবে!

সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ীদের যমানায় এ জাতীয় কোনো কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। তাদের যমানায় নবী বা অন্য কারো কবরে কোনো নির্মাণ থাকত না। সুতরাং তাদের পরবর্তীরা এমন যা কিছু নির্মাণ করেছে, সে বিষয়ে আপনি কী বলবেন? সেগুলো বিদআত নয় তো কী?

কবর যিয়ারতের বৈধতা ছিল মৃতের জন্য দুআ ও নিজেরা উপদেশ গ্রহণের জন্য, কিন্তু আজ কবর-মাযারে কী হয়? মানুষ গরু-ছাগল, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সাথে নিয়ে মাযার-দরগায় যায়। খাজা বাবা কবর ওয়ালার জন্য হাদিয়ে নিয়ে, মানত হিসেবে তাকে নজরানা দিতে এসব নিয়ে যায়। কবরকে তারা তওয়াফ করে। কবরের মাটি শরীরে মাখে। মৃত ব্যক্তির নামে, আওলিয়াদের নামে তারা কসম খায়। খাজা বাবা বা পীরের পরিবর্তে আল্লাহর নামে কসম খেলেও তাদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এ সব কবরের সম্মান ও মর্যাদা তাদের হৃদয়ে এতটাই জায়গা নিয়ে আছে।

অনেকে মাযার এলাকায় ঢুকানোর আগেই আল্লাহর অলীর সম্মানে জুতা খুলে হাতে নেয়। কবরের মাটি নিয়ে তাবাররুক হাসিল করে। কেউ কেউ কবরে হাত রাখে। তারপর সেই হাত শরীরে মাসাহ করে। মহিলাদেরকে দেখবেন, তাদের কোলের শিশুকে কবরের উপর ধরে নাড়াচাড়া করে। সন্তানের বরকতের জন্য কবরস্থ বুয়ুর্গের কাছে দুআ করে। কেউ আবার কবরকে সিজদা করে। রোগমুক্তি, হাজত পূরণ এমন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কবরের কাছে এতেকাফ করে। দর্শনার্থীদের দেখবেন, মাযারের সামনে গিয়ে কত বিনয়, কান্নাকাটি ও খুশখুশু প্রকাশ করে।

এই কবরস্থ বুয়ুর্গরা তাদের ইলাহে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার সাথে কোনো নবী বা ফেরেশতা; কারো ইবাদত বরদাশত করেন না। সুতরাং তার সাথে যখন এ সব বুয়ুর্গদের ইলাহ বানানো হচ্ছে, তা তিনি কিরূপে বরদাশত করবেন? সোজা কথা! কিছুতেই তিনি তা বরদাশত করবেন না। বাস্তবতা তো এটাই যে, এ সব বুয়ুর্গরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নিজেদের উপকার করারই ক্ষমতা রাখেন না। অতএব, অন্যদের তারা উপকার করতে পারার তো প্রশ্নই উঠে না।

দেবীর বিনাশ সাধন

বর্তমানে যারা কবরকে সম্মান ও ভয় করে তাদের অবস্থা অনেকটা সেই বনী সাকীফের মতো যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের পূর্ববর্তী ক্ষমতাহীন মূর্তিকে অর্থহীন ভয় পেত।

ইসলাম যখন আরব ভূখণ্ডে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, আরবের বিভিন্ন গোত্র তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে তাদের প্রতিনিধিদল পাঠাতে লাগল তখন সাকীফ গোত্রের দশোর্থর ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শোনাতে মসজিদে নববীতে তাদের বসার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তারা যখন নিজেদের ইসলামের ঘোষণা দিতে যাবে; তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের নিজেদের দীর্ঘকালের উপাস্য মূর্তির কথা মনে পড়ল। তাদের মূর্তির নাম ছিল রাক্বা। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুদ, যিনা ও মদপানের হুকুম জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে হারাম বলে জানালে তারা তা মেনে নিল। এরপর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাক্বার ব্যাপার আপনার সিদ্ধান্ত কী? রাক্বার সাথে আপনি কী আচরণ করবেন? তিনি জবাব দিলেন, ঐ মূর্তিটিকে তোমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তারা সবিস্ময়ে ভীত গলায় বলল, রাক্বা যদি জানতে পারে আপনি তাকে ভাঙতে চাইছেন, তাহলে সে আমাদের পরিবার-পরিজন, আশপাশ সব ধ্বংস করে ফেলবে।

হযরত ওমর ফারুক রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের হাস্যকর মন্তব্য শুনে বললেন, এই সাকীফের দল! কী আশ্চর্য! তোমরা কী মূর্খ? আরে রাক্বা তো নিছক একটি পাথর! তা কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।

সাকীফের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে তাকিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কখনোই রাক্বাকে ভাগ্যতে পারব না। তাকে ভাগ্যতে হলে আপনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, সত্ত্বরই আমি তোমাদের কাছে এমন লোকদের পাঠাব যারা তোমাদের সাহায্য ছাড়া একাই রাক্বাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। তারপর প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতিসহ স্বজাতির কাছে ফিরে এসে তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করল। এভাবে সময় বয়ে চলল। তারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিতে লাগল, অথচ তাদের হৃদয়ে তখনো রাক্বার ভয় বিরাজমান। কে জানে? কখন রাক্বার গ্যবে তারা নিপতিত হয়!

এরপর এক সময় হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ ও মুগীরা বিন শুবা সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নিয়ে তাদের কাছে গেলেন। সাকীফের এলাকায় পৌঁছে প্রথমেই তারা রাক্বা মূর্তি ভাঙ্গার অভিযান পরিচালনা করলেন। রাক্বা মূর্তির কাছে গিয়ে দেখেন সেখানে যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সব সমবেত হয়েছে। তারা সবাই অজানা শঙ্কায় শঙ্কিত। ভয়ে থরথর কম্পমান। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, রাক্বাকে কেউ কখনো ভাগ্যতে পারবে না, বরং রাক্বাকে যে ছুঁবে সেই অভিশপ্ত হয়ে নির্মম মৃত্যুবরণ করবে।

হযরত মুগীরা ইবনে শুবা রাযি. কুড়াল হাতে এগিয়ে গেলেন। সাখীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কি এদের সাথে একটু কৌতুক করে তোমাদের হাসাব না?

তারা বললেন, ঠিক আছে, তাই করুন।

মুগীরা আঘাত করতে কুড়াল হাতে রাক্বার আরো কাছে গিয়ে কুড়াল ছুঁড়ে মেরে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলেন। সাকীফ গোত্রের উপস্থিত লোকেরা এ

দৃশ্য দেখতে পেয়ে চিৎকার জুড়ে দিল ‘মরেছে, মরেছে। রাব্বা মেরে ফেলেছে, রাব্বা মেরে ফেলেছে’ বলে ধ্বনি তুলতে লাগল।

তারা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ ও অন্যদের দিকে তাকিয়ে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যের সুরে বলতে লাগল, ‘এবার হয়েছে। যাও দেখি, কার সাহস? রাব্বা কাউকে ছাড়বে না। তোমরাও তোমাদের সাথীর মতোই মারা পড়বে।’

মুগীরা তাদের আনন্দে হতবিহবল অবস্থা দেখছেন। তাদের মূর্তি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে মনে করে তারা বেজায় খুশি। এর মধ্যে মুগীরা পড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এই সাকীফ গোত্র! আমি তো খানিকটা অভিনয় করলাম। রাব্বা পাথর আর মাটি ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই তোমরা রাব্বাকে ছেড়ে আল্লাহর আশ্রয়ে, তাঁর গোলামীর প্রতি ধাবিত হও। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক আঘাতে রাব্বাকে কয়েক টুকরা করে ফেললেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম একযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আঘাতে আঘাতে মূর্তিটিকে ধুলিস্মাৎ করে দিলেন।

শিরকের উৎস সন্ধানে

পৃথিবীর বুকে কিভাবে শিরক জন্মাল ও বেড়ে ওঠল? এর উৎস কোথায়? আপনি যদি একটু গভীরভাবে ইতিহাস যাচাই করেন তাহলে দেখবেন, বুয়ুর্গদের প্রতি অতিভক্তি ও তাদের সম্মান প্রদানে বাড়াবাড়ি থেকেই ক্রমান্বয়ে শিরক অস্তিত্ব লাভ করেছে।

নূহ সম্প্রদায়ের মাঝে প্রথমে সকলেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। পৃথিবীর বুকে কোথাও তখন শিরকের অস্তিত্ব ছিল না। নূহ সম্প্রদায়ের মাঝে পাঁচজন বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াদ, সুআ, যাগুস, যাউক ও নসর। এ সকল বুয়ুর্গ ব্যক্তিগণ একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে নূহ সম্প্রদায় দূর্শ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ল। বিষন্নতা তাদেরকে বিপন্ন করে তুলল। তারা ভাবতে লাগল, যারা আমাদের সব সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করাতেন, আল্লাহর আনুগত্যের পথ দেখাতেন, আজ তাদের বিদায়ে কে আমাদের আল্লাহর কথা বলবে? কে আমাদের ইবাদতের পথে ডাকবে?

তাদের এ ভেঙ্গে পড়া ও বিষন্নতাকে শয়তান পুঁজি বানাল। সে সঙ্গোপনে তাদের কাছে এসে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, তোমরা যদি তাদের প্রতিকৃতি বা ভাস্কর বানিয়ে মসজিদে নিয়ে প্রতিস্থাপন কর, তাহলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। তাদের প্রতিকৃতি দেখে তোমরা অনুপ্রাণিত হবে। তাদের প্রতিকৃতি দেখে তোমাদের মনে ইবাদতের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে।

শয়তানের এই প্ররোচনা তাদের মনে ধরল। গভীর উপলব্ধিতে না গিয়ে তারা আবেগের জোয়ারে ভাসল। শয়তানের পরামর্শ মোতাবেক বুয়ুর্গদের মূর্তি বানিয়ে স্বরক ও প্রতীক হিসেবে সেগুলোকে মসজিদে এনে স্থাপন করল। তবে তারা এই সব মূর্তিদের কাছে কোনো দুআও করত না। তাদের সিজদা বা ইবাদতও করত না। মূর্তিগুলো কেবলই স্মৃতিফলক হিসেবে বিবেচিত হত। এ সব মূর্তি দেখে বাস্তবেই তাদের হৃদয়ে ইবাদতের আকাঙ্ক্ষা জাগত। ফলে মূর্তিগুলো তাদের আল্লাহর ইবাদতের সহায়কই ছিল।

এভাবে বেশ অনেক বছর অতিবাহিত হল। প্রজন্ম পরিবর্তন হল। পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা তাদের বড়দের এ সব মূর্তিদের সম্মান করতে দেখেছে। তাদের প্রশংসা করতে শুনেছে। কাজেই তারাও পূর্বসূরীদের কর্মধারা অপরিবর্তিত রাখল। এভাবে কয়েক প্রজন্ম গত হওয়ার পর শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করল। তাদের মাঝে এমন ভাবধারা তৈরি করল যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা এ সব মূর্তির ইবাদত করত। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা সঙ্কটে তাদের আশ্রয় চাইত। তাদের কাছে দুআ করত। কাজেই আমরাও যদি তাদের মতো সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরও এদের ইবাদত করা উচিত। যেই ভাবা সেই কাজ। মানুষ মূর্তিকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করল। শয়তানের প্রচেষ্টা সফল হল।

তাদের অবস্থা দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আ.কে তাদের কাছে নবী বানিয়ে পাঠালেন। তিনি সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত মানুষকে তাওহীদের প্রতি ডাকলেন। কিন্তু খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। অন্যরা তাদের পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য মূর্তিদেরকে ছাড়তে সম্মত হল না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন। মহাপ্লাবন দ্বারা তিনি তাদের ধ্বংস করে দিলেন। এভাবেই নূহ আ.এর সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে প্রথম শিরক জন্ম লাভ করেছিল।

যেভাবে শিরক দানা বাঁধে

আজ মাযারী ভাইদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই। কিভাবে কবর ও মাযারের সাথে মানুষের সম্পর্ক হয় এবং কিভাবে ক্রমান্বয়ে তা শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, সে বিষয়ে কিছু কথা রাখতে চাই।

প্রথমত হৃদয়ে বুয়ুর্গানেদীনের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মায়। সেই অনুভূতি থেকেই বুয়ুর্গানেদীনের পূণ্যভূমি যিয়ারত করতে ভাল লাগে। মৃত্যু বা আখেরাতের স্মরণে নয়, বরং তাদের কাছে গিয়ে আল্লাহকে ডাকলে সেই দুআ কবুলের প্রত্যাশা থেকেই মাযার, দরগা আর সৌধ গমনের প্রবণতা জন্মায়। তারপর কবর স্পর্শ ও গা মুছা, তারপর আল্লাহর কাছে সুপারিশের জন্য কবরস্থ বুয়ুর্গকে উসীলা গ্রহণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে মনে হয়, মৃত বুয়ুর্গের আল্লাহ তাআলার কাছে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর আমি বেচারী অভাবগ্রস্ত, গোনাহে জর্জরিত। আমি অধম কী করে মহান আল্লাহর কাছে সরাসরি দুআ করব? কাজেই আল্লাহর কাছে চাইতে হলে আমাকে কবরওয়ালা বুয়ুর্গকে মাঝখানে উসীলা বানানো প্রয়োজন।

এরপর শয়তান দর্শনার্থীর মনে কুমন্ত্রণা দেয়, কবরস্থ ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহর কাছে বেশ সম্মান রাখেন, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তাআলা তাকে কিছু ক্ষমতা দিয়ে থাকবেন। এই কাল্পনিক ক্ষমতার ধারণা থেকে বেচারী দর্শনার্থী কবরস্থ ব্যক্তিকে ভয় পেতে থাকে এবং তার কাছে বিভিন্ন আশা করতে থাকে। তারপর সে কবরস্থ মৃতের কাছে দুআ করে। কবরের উপর গম্বুজ, মাযার ইত্যাদি নির্মাণ করে। তারপর কবরওয়ালার ক্ষমতা আর কারামতের কাল্পনিক সব গল্প রটনা করে। ‘অমুক মহিলা বুয়ুর্গের কাছে দুআ করে স্বামী পেয়েছে, আরেকজন সন্তান চেয়ে সন্তান পেয়েছে’ এমন আজব সব গল্প রচনা করে।

এদের অনেকে আবার বলে ‘কেউ ফিরে না খালি হাতে, খাজা বাবার দরবার হতে।’ মানে যে মাযার বা পবিত্র দরগার যিয়ারতে আসে তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। মানুষের ধারণা কেমন, দেখুন! এক ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করা হল, ‘আল্লাহর নামে কসম বাদ দিয়ে মাযারের নামে কেন কসম করছ?’

সে উত্তর দিল, আল্লাহর নামে কসম করলে এখানকার ক্রেতারা বিশ্বাস করে না। কিন্তু মাযারের পীরের নামে কসম করলে তারা বিশ্বাস করে। নাউয়ু বিল্লাহ! এভাবে মাযারের সম্মান এই সব ব্যক্তিদের কাছে আল্লাহর সম্মানের চেয়েও অধিক গণ্য হয়!

এদের অবস্থাও আগের যুগের পাথর পূজারীদের চেয়ে কম কিছু নয়। হযরত আবুররাজা আলআতারিদি রাযি. বলেন, জাহেলী যুগে আমরা মূর্তি ও পাথরের পূজা করতাম। একবার আমরা এক সফরে বের হলে আমাদের উপাস্য পাথরটিকেও সাথে নিয়ে নিলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন সফরাবস্থায় কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে রান্নার পরিকল্পনা করতাম তখন তিনটি পাথরের প্রয়োজন হত। তিনটি পাথর যমীনে স্থাপন করে তার নীচে লাকড়ী দিয়ে, তারপর সেই পাথরের উপর ডেক বসিয়ে রান্না করা হত।

ঘটনাক্রমে এবার সফরে বের হওয়ার পর পশ্চিমধ্যে আমাদের রান্নার প্রয়োজন হলে আমার উপযুক্ত পাথরের অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু রান্নার ডেক চড়ানোর জন্য উপযুক্ত তিনটি পাথর পাচ্ছিলাম না। ফলে বাধ্য হয়েই আমাদের মাবুদ পাথরটিকে থলে থেকে বের করলাম। তারপর তার উপর রান্না চড়িয়ে পাক করে খেলাম। আর মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম যে, আগুনের সংস্পর্শে আমাদের মাবুদের দেহও কিছুটা গরম হওয়ার সুযোগ পাবে। এভাবে সফরের প্রথম দিন আমরা পার করলাম।

জাহেলী যুগের মানুষের জ্ঞানের কী চরম অবনতি ঘটেছিল; এ ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এমনই চরম অবক্ষয়ের ক্রান্তিলগ্নে এই ভূ-পৃষ্ঠে ইসলাম আগমন করে আর সমাজ থেকে এসব মূর্থতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে।

আবুররাজা বলেন, একদিন সফর করার পরের দিন কাফেলার এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, তোমাদের রব হারিয়ে গেছে। কাজেই তাকে খুঁজে বের কর।

রব হারানোর দুঃসংবাদ শুনে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আমরা পাহাড়-টিলা, সমতল ভূমি সর্বত্র তাকে খুঁজলাম। কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ একজন চিৎকার দিয়ে উঠল, এই যে! আমি তোমাদের রবকে পেয়ে গেছি কিংবা তার মতোই একটি রব খুঁজে পেয়েছি।

কাছে এগিয়ে দেখলাম, সবাই একটি পাথরের টুকরাকে মূর্তি বানিয়ে সিজদা করছে। এরপর আমরা সকলে তার জন্য উট জবাই করে কুরবানী করলাম। কী অদ্ভুত মানুষের বিবেক! এদের ব্যাপারেই ইরশাদ হয়েছে-

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থাৎ তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না, আর বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী; তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছে যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র ও তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে অনেক উর্ধ্বে। [সূরা ইউনুস- ১৮]

মাযারী ভাইদের আমরা বলি, আপনাদের সাথে আমরা সহমত যে, আল্লাহ তাআলা নবী ও অলীদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করবেন। নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের রব আমাদেরকে তাদের কাছে দুআ করতে, তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আশ্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরাম, শুহাদায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করতে পারবেন, ঠিক আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অধিকার থাকবে না। যার তার জন্য তারা সুপারিশ করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ তাআলা কেবল ঐ সকল লোকদের জন্যই তাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন যাদের প্রতি আল্লাহর সন্তোষ থাকবে। অন্য কারো জন্য সুপারিশ করার অনুমতি তাদের থাকবে না।

কাজেই মাযার সংশ্লিষ্ট ভাইদের আমি বলব, আসুন! আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিই। কেবল তার প্রতিই ঈমান আনয়ন করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখছেন, এ বিশ্বাস রেখে সত্য করে বলুন তো! সালফে সালেহীন বুয়ুর্গানেদ্বীন কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো কবর বা মাযারের উসীলা গ্রহণ করতেন? তাদের একজনও কি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম কিংবা আহলে বাইতের কবরে গিয়ে কখনো নিজেদের অভাবের কথা বলে তাদের কাছে অভাব দূর করতে

বা বিপদ-আপদ দূর করতে বলেছেন? তাদের এমন কাজের কোনো নজীর কি আপনার কাছে রয়েছে?

যে উসীলা গ্রহণ শরীয়তে বৈধ

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর বিন খাত্তাবের যামানায় মদিনা মুনাওয়ারায় সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির দিকে একটু লক্ষ্য করুন! একবার হযরত ওমরের যামানায় দীর্ঘদিন বৃষ্টি বন্ধ। লোকেরা ওমরের কাছে অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি সকলকে নিয়ে ময়দানে বের হলেন। সেখানে বৃষ্টির জন্য জামাতের সাথে নামায আদায় করে অত্যন্ত অণুনয় ও কাকুতি-মিনতি করে হাত উঠিয়ে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আগে কখনো আমরা অনাবৃষ্টিতে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর দুআর উসীলা গ্রহণ করতাম। ফলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করতেন। আজ আমরা নবীজির চাচার দুআর অসীলা নিয়ে দুআ করছি। তারপর তিনি হযরত আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আব্বাস! আপনি দুআ করুন। আপনি দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের বৃষ্টি দান করেন।

হযরত আব্বাস দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন। লোকেরা তাঁর দুআয় কাঁদলেন এবং আমীন আমীন বললেন। দুআর মাঝেই আকাশে মেঘ দেখা দিল। কিছুক্ষণের মাঝেই বৃষ্টি শুরু হল।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.এর কর্মপন্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। তারা আমাদের চেয়ে দীন বেশি বুঝতেন। আমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি ভালোবাসতেন। তারপরও তারা বিপদ-আপদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর রওযার দিকে দৌড়াতে না। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর তাঁর কবরের কাছে গিয়ে বলতেন না, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন।’ তারা কখনোই এমন করতেন না। কারণ তারা জানতেন, মৃতের কাছে কিছু চাওয়া জায়েয নেই। হোক তিনি কোনো নবী বা রাসূল।

কিন্তু হায় আফসোস! আজ লোকেরা কিছু পঁচাগলা হাড়িডর কাছে গিয়ে নিজেদের মাগফিরাত ও রহমতের দুআ করে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে

চাই, আপনারা কি মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিকৃতি ও ছবি নির্মাণ করতে অযথাই নিষেধ করেছিলেন। নাকি তিনি এ সবেবর কারণে মুসলমানদের আবার পূর্ববর্তী জাহেলী যুগেই ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন? বর্তমানের কবর ও মাযারকে শ্রদ্ধা করা আর অতীতের মূর্তি ও প্রতিকৃতিকে শ্রদ্ধা করার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি?

গাইরুল্লাহর নামে উসীলা গ্রহণ ও কসম করার শরয়ী বিধান

শিরকের একটি মাধ্যম হচ্ছে, গাইরুল্লাহর (তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো) নামে কসম করা। সুতরাং কাবার নামে, আমানতের নামে, কারো সম্মানের নামে বা কারো জীবনের নামে কিংবা কোনো নবী বা অলীর সম্মানে কসম করা জায়েয নেই। এমন কসম করা হারাম। কারণ এসবের নামে কসম করা তাদের এমন সম্মানকে বুঝায়, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো জন্য হতে পারে না।

ইমাম আহমাদ হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করল সে শিরক করল।’ তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তির কসম করতে হয় সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে কিংবা চুপ থাকে।’

কোনো ব্যক্তি যদি গাইরুল্লাহর নামে কসম করে এবং এই বিশ্বাস লালন করে যে, তার কসমকৃত ব্যক্তির সম্মান আল্লাহ তাআলার সমতুল্য, তাহলে তা মারাত্মক পর্যায়ের শিরক। আর যদি কসমকৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর চেয়ে কম মর্যাদাবান মনে করে, তাহলেও তা শিরকমুক্ত নয়। তবে এটা ছোট পর্যায়ের শিরক।

ভুলবশত কেউ গাইরুল্লাহর নামে কসম করে ফেললে তার কর্তব্য হচ্ছে, তাৎক্ষণিক কালেমা পড়ে নেয়া। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি যদি কসম করতে গিয়ে লাত-উজ্জার নামে কসম করে সে যেন পড়ে নেয়, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তবে যাদের মাঝে গাইরুল্লাহর কসম খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং অবলীলায় এমন কসম মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অভ্যাস রয়েছে, তাদের উচিত এটা পরিহার করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। তদ্রূপ যাদের মুখে এমন কথা চলে আসে, ‘অমুক এবং আল্লাহ যদি না থাকত তাহলে এই এই হত’ বা ‘অমুক এবং আল্লাহ ছাড়া আমার কেউ নেই’ কিংবা ‘আল্লাহ ও অমুকের বরকতে’ এ জাতীয় কথাগুলোও বর্জনীয়। এ সব বর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা জরুরী। এ সব ক্ষেত্রে কারো অবদানের স্বীকার করতে হলে তার কথা বলে মাশাআল্লাহ বলা যেতে পারে।

শিরকের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে, চোখ ইত্যাদির কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে তাবীজ-কবজ ঝুলানো। কেউ যদি এগুলোকে কেবল রোগবালা দূর করার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে তা ছোট শিরক হিসেবে গণ্য। আর যদি এগুলোকে কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিপদদূরকারী হিসেবে বিবেচনা করে তাহলে তা মারাত্মক পর্যায়ে শিরক হিসেবে গণ্য হবে। কারণ এটা গাইরুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্টতার অংশ এবং এর মাধ্যমে সৃষ্টি ও ক্ষমতায় গাইরুল্লাহকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়।

তাবীজ দু’ধরণের। ১. কুরআন থেকে তাবীজ। যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, চামড়া বা স্বর্ণ-রূপার টুকরা ঝুলানো। যার উপর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লেখা থাকে। এই তাবীজ গ্রহণ করা জায়েয নেই।

প্রথমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করেছেন বা এমন করার অনুমতি দিয়েছেন বলে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া ক্রমান্বয়ে এটা কুরআন ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর প্রতি সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২. কুরআন বর্হিভূত তাবীজ। যেমন কাপড়, চামড়া ইত্যাদিতে কোনো জিন বা জাদুমন্ত্র লিখে তা দেহে ঝুলিয়ে রাখা। এটা স্পষ্টতই একটি শিরকী পদ্ধতি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি থেকে তাবীজ খুলে ফেলল সে যেন একজন গোলাম আযাদ করল।’

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লোহার চুরি পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী?

সে জবাব দিল, রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটা পরেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা খুলে ফেল। কারণ এটা তোমার রোগকেই বৃদ্ধি করবে। এটা পরিহিত অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে তুমি কখনোই সফল হতে পারবে না।

শিরকের আরেকটি মাধ্যমে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ‘আলেমুল গায়েব’ দাবী করা। কারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন না। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

অর্থাৎ বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। [সূরা নামল- ৬৫]

সুতরাং কারো জন্য কখনোই গায়েব জানার সুযোগ নেই। কোনো নিকটতম ফেরেশতা বা নবী-রাসূল কেউই এ সম্পর্কে অবগত নন। তবে আল্লাহ তাআলা যদি কোনো নবীকে অহীর মাধ্যমে কোনো তথ্য জানিয়ে দেন- যেমন কাফিরদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এবং কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন- তাহলে নবী তা জানতে পারেন।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ইলমে গায়েবের দাবী করে, সেটা হাত দেখে হোক বা পেয়ালার মাধ্যমে বা নক্ষত্র দেখে কিংবা জ্যোতিষ বিদ্যা বা জাদুবিদ্যার মাধ্যমে, এমন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও কাফির।

জাদুকর বা গণকরা যে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি বা বস্তু কিংবা বিভিন্ন রোগের বিষয়ে বলতে পারে তা মূলত দুষ্ট জিন ও শয়তানের যোগসাজশে করে থাকে। কাজেই তাদের কাছে গায়েব জানার ক্ষমতা আছে; এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কিছু দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি গণকের কাছে তাদের ভবিষ্যত জানতে, বিয়ে-শাদি সম্পর্কে জানতে দারস্থ হয়। এটা সম্পূর্ণ হারাম। কেউ গায়েব জানার দাবী করলে বা কেউ অপরকে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করলে সে কাফির। পেপার বা ম্যাগাজিনে রাশিফল দেখা বা

গায়েব জানার দাবীদারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা কিংবা তাদের কাছে প্রশ্ন করা; সবই হারাম।

শিরকের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে, জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা বা ভাগ্যগণনা চর্চা করা। এগুলো মারাত্মক পর্যায়ে গৌনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই কাজগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু করা..।

জাদুর মাঝে দুষ্ট জিনদের সহায়তা নিতে হয় এবং তাদের মনমতো কাজ করতে হয়। তাহলেই কেবল জিনেরা জাদুকরের সহযোগিতা করে। জাদুর মাঝেও গায়েবের দাবীদার হওয়ার প্রবণতা আছে। যা কুফরী ও ভ্রান্ত পথ। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.

অর্থাৎ তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যাই করুক সে সফল হবে না। [সূরা ত্বাহ- ৬৯]

জাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, মৃত্যুদণ্ড। সাহাবায়ে কেরাম স্বয়ং জাদুকরের এ দণ্ডই কার্যকর করেছেন।

আফসোস! জাদুর বিষয়ে মানুষ আজ শিথিল। বর্তমানে এটা একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এখন জাদুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বিপুল কৌতুহলী দর্শক ও সমর্থক এ সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। এটা দ্বীনি আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি চরম শৈথিল্যের বহিঃপ্রকাশ।

জাদুকরের দণ্ড

জাদুকরের ক্ষেত্রে হযরত আবু যর গিফারী রাযি.এর নীতি কতই না চমৎকার ছিল। হযরত আবু যর গিফারী একদিন খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন।

সেখানে তিনি একজন জাদুকরকে তরবারী হাতে খেলা প্রদর্শনরত দেখতে পেলেন। সে মানুষকে চমকে দিচ্ছিল। একজন ব্যক্তির কাছে গিয়ে সে তার মাথা কেটে ফেলছিল। আবার সেই মাথা জোড়া লেগে যাচ্ছিল।

পরের দিন আবার আবু যর খলীফার দরবারে এলেন। আজ তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে নিচে তরবারী লুকিয়ে নিয়ে এসেছেন। আগের দিনের মতো আজো জাদুকর খেলা দেখিয়ে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করছে। হযরত আবু যর ধীরে ধীরে জাদুকরের কাছে চলে এলেন। হঠাৎ চোখের পলকে তরবারী বের করে জাদুকরের ঘাড়ে আঘাত করতে উদ্ধত হলেন। তিনি তরবারী উঁচু করে ধরে আছেন আর জাদুকর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আবু যর তার দিকে চেয়ে বার বার বলছিলেন, পারলে এবার তুমি নিজেকে বাঁচাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, তরবারীর আঘাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষির কাছে এসে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর প্রতি নাযিলকৃত বিষয়কে অস্বীকার করে।

সতর্কবার্তা : জাদুকর, গণক বা জ্যোতিষিরা অনেক সময় নেককারের ভান করে মানুষদেরকে গাইরুল্লাহর নামে বিশেষ গুণবিশিষ্ট ছাগল বা মুরগী ইত্যাদি জবাই করতে বলে। আবার অনেক সময় শিরকমূলক তাবীজ বা মন্ত্র লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে বলে কিংবা বাড়ির কোথাও এ সব লুকিয়ে বা পুতে রাখতে বলে আর বাহ্যত দরবেশের বেশ ধরে। কারামত ও অদ্ভুত বিষয় প্রকাশের ক্ষমতাবানরূপে নিজেকে জাহির করে। যেমন অস্ত্র বা গাড়ির চাকার নিচে সে চলে যায়, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় না। মূলত এসব ম্যাজিক ও ভেলকিগুলো জাদুরই একটি প্রকার। শয়তানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এ সব ম্যাজিক দেখানো হয়ে থাকে। কাজেই কোনো মুসলিম যেন তাদের অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শনে প্রভাবিত ও প্রতারিত না হয়; সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

ঈমান বিনাশী কর্ম

দ্বীন নিয়ে উপহাস : যে সব কাজ ঈমানকে নষ্ট করে দেয় তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, দ্বীনকে নিয়ে বা কোনো দীনি বিষয়ে ঠাট্টা করা। এরূপ ঠাট্টার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুরতাদ হিসেবে গণ্য হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ.

অর্থাৎ আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলে দেবে, আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাসা করছিলাম; তুমি বলে দাও, তবে কি তোমরা আল্লাহ; তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি-তামাসা করছিলে? তোমরা ওয়র আপত্তি প্রদর্শন কর না, তোমরা তো ঈমান কবুলের পর কুফরী করেছ; যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই, কারণ তারা অপরাধী ছিল। [সূরা তওবা : ৬৫-৬৬]

এরূপ ঠাট্টার একটি নমুনা হচ্ছে, বর্তমানের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকে, ইসলাম প্রাচীন ধর্ম। এ যুগের সাথে তা যায় না। এটা পশ্চাদপদতা ও মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার নামান্তর। তারা বলে, প্রচলিত আইন ইসলামী আইনের চেয়ে মানানসই ও শ্রেয়। এ সব বক্তব্যের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে মুরতাদ সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহর আইন বর্জন : ঈমান বিনষ্টের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হচ্ছে, তাঁর আইন অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করা। কথাবার্তা, কাজকর্ম, মামলা-মোকাদ্দমা, ধন-সম্পদ এবং সব ধরনের বিচার ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী হুকুম প্রদান করে না, এমন লোক তো কাফির। [সূরা মায়েদা- ৪৪]

সুতরাং বেচাকেনা, লেনদেন, চুরি-যিনা সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করা মুসলমানদের ওপর ফরয। ইসলাম কেবল বিয়ে-তালাক আর ব্যক্তিগত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

সুতরাং যারা নিজেরা আইন প্রণয়ন করে এবং মনে করে তাদের রচিত আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে বেশি কার্যকরী ও শ্রেষ্ঠ, তারা কাফির। আল্লাহ তাআলা বলছেন-

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.

অর্থাৎ তাদের কি এমন কতকগুলো শরীকও আছে যারা তাদের জন্যে ধর্মের এমন বিধান প্রবর্তন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? [সূরা শূরা- ২১]

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে-

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থাৎ তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-যাজকদের রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়ামের পুত্র মসীহকেও অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক মাবুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশ স্থির করা হতে পবিত্র। [সূরা তওবা- ৩১]

যখন উল্লিখিত আয়াত নাযিল হল, তখন হযরত আদি ইবনে হাতেম রাযি. তা পড়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি আল্লাহ যাকে অবৈধ করেছেন সেটাকে বৈধ সাব্যস্ত করত না এবং তোমরাও তা বৈধ মনে করতে না? তারা কি আল্লাহ যাকে বৈধ করেছেন সেটাকে অবৈধ করত না এবং তোমরাও তা অবৈধ মনে করতে না? আদি রা. জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তা

করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই তাদের ইবাদত করা ও তাদেরকে রব মানার নামান্তর।

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব : ঈমান বিনষ্টের আরেকটি কারণ হচ্ছে, কাফিরদের সাথে সখ্যতা আর মুমিনদের সাথে শত্রুতা। মুসলমানদের জন্য কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব থেকে বিরত থাকা জরুরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ হে মুমিনরা! তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজ্রত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে না। মুমিন নারীরা কাফিরদের জন বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে ম্বর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না। তোমরা যা ব্যয় করেছে তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান, তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। [সূরা মুমতাহিনা- ১০]

কুরআনের আয়াত দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, এই সকল ব্যক্তির কাফির এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

বর্তমানের কাফিরদের সাথে মুসলমানদের সখ্যতার কিছু দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নিয়ত ছাড়া তাদের সাথে বন্ধুত্ব বা মেলামেশা করা, কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করা, প্রয়োজন ছাড়া কাফির রাষ্ট্র ভ্রমণ করা

কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ ও লাইফ স্টাইলে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা কিংবা প্রয়োজন ছাড়া তাদের ভাষায় কথা বলা।

সাহাবা বিদ্বেষ : ঈমান বিনষ্টের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম বা আহলে বাইতদের প্রতি বিদ্বেষ বা তাদের গালাগাল করা। আমরা সকল সাহাবাকেই ভালোবাসি। তবে ভালোবাসায় বাড়াবাড়িকে সমর্থন করি না। হযরত আলী রাযি. হোন বা অন্য কেউ; সকলকেই আমরা ভালোবাসি। তাদের কারো থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত বা পবিত্র বা সম্পর্কহীন বলি না। আমরা তাদেরকে ভাল বলেই স্মরণ করি।

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবস্থান হচ্ছে, নীরবতা অবলম্বন। তারা মানুষ ছিলেন। তারাও ঠিক-বেঠিক করে থাকবেন। আমাদের তরবারীকে যেমন আল্লাহ তাআলা সেই ফেতনা থেকে বাঁচিয়েছেন আমাদের যবানকেও আমাদের সেই ফেতনা থেকে বাঁচানো উচিত। আমাদের বক্তব্য, তাদেরও তো রব আছেন যিনি তাদের হাশরের মাঠে সমবেত করে ফয়সালা করবেন। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আমার ফয়সালা করার অধিকার কোথায়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর সমস্ত উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে আমরা আবু বকর রাযি.কেই খেলাফতের যোগ্য বিবেচনা করি। এরপর পর্যায়ক্রমে ওমর, উসমান ও আলীকে যোগ্য মনে করি।

ঈমান বিনষ্টের আরেকটি কারণ হচ্ছে, মিলাদুন্নবী বা কোনো পীর-বুয়ুর্গের জন্মদিনে উরশ পালন করা। এ সব নিকৃষ্ট বেদয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম কখনো এ সব পালন করেননি। সহীহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ইসলামের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।' আল্লাহ তাআলা বলেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। [সূরা মায়দা- ৩]

কুরআনের এই বাণী অনুসারে দীনকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কাজেই জন্মউৎসব পালন করা যদি দ্বীনের অংশ হত এবং আল্লাহ তাআলা তা পালনে সম্মত থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উম্মতকে অবগত করতেন।

উলামায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে মিলাদুন্নবী পালনকে নিষেধ করেছেন। বিশেষত যেখানে তা পালনে অতিরঞ্জন, নারী-পুরুষের মেলামেশা বা গানবাদ্যের ব্যবহার হয়; সেক্ষেত্রে একে জায়েয মনে করার তো প্রশ্নই উঠে না। উপরন্তু এ সব অনুষ্ঠানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে প্রার্থনা করা হয়, তার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, যা সুস্পষ্টরূপে শিরক। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করাও কুফরী।

আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ আলেমুল গায়েব নন। কিয়ামতের দিন তিনি ছাড়া কারো ক্ষমা করার অধিকার থাকবে না। দুনিয়া বা আখেরাতে ফয়সালা কেবল তাঁর যার হাতে আসমান ও যমীনের রাজত্ব। অথচ মীলাদ-উরশে ব্যাপকভাবে নবী-অলীদের জন্য এ জাতীয় ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

হ্যাঁ, যদি এ সব অনুষ্ঠানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সীরাত ও জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা থাকত না। তবু সেক্ষেত্রেও উচিত হচ্ছে, বছরের সুনির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণ নির্ধারণ না করা, বরং মসজিদের মিম্বারে, সেমিনার বা মাহফিল সর্বত্র এ আলোচনা সব সময় চলমান থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের অন্তর্গত আদেশ দাতাগণের; অতপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয়, তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও- যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করে থাক। [সূরা নিসা- ৫৯]

তারপর আমরা কুরআন খুঁজে দেখলাম। কিন্তু কোথাও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মীলাদুন্নবী পালন করতে বলেছেন বলে পেলাম না, বরং তিনি আমাদের বলেছেন, দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর আমরা সুন্নাতের মাঝে খুঁজলাম। সেখানেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পালন করেছেন বা করতে বলেছেন বা অন্তত সাহাবায়ে কেরাম করেছেন বলেও কোনো বর্ণনা পেলাম না। কাজেই সচেতন মুসলমানদের উচিত, বহু মুসলমান তা পালন করছে মনে করে প্রবঞ্চিত না হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

অর্থাৎ (হে নবী) তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথার অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা তো নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না। [সূরা আনআম- ১১৬]

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আজ কিছু মানুষ এ সব বেদয়াতমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতায় মাতে। অথচ জামাতে নামাযের ব্যাপারে তারা থাকে সবার পিছনে। এদের কেউ কেউ আবার মীলাদুন্নবীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির হন বলে বিশ্বাস করে। এজন্য তারা দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানায়। আমরা সকলেই জানি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর ভালোবাসা ও তাঁকে সম্মান করা ছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। আর তাঁকে সম্মান জানানোর উপায় হচ্ছে, তাঁকে নিজের অনুসরণীয় ব্যক্তি ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা আমাদের জন্য জায়েয হবে না।

আরেকটি বেদয়াত হচ্ছে, লাইলাতুল মেরাজ উদযাপন করা। অথচ নবীজির ইসরা ও মেরাজ কোনো বছর বা মাসে সংঘটিত হয়েছে, তা কোনো সহীহ বর্ণনা দ্বারা সুপ্রমাণিত নয়। আর নির্ধারিত দিনের প্রমাণ থাকলেও এদিনে আলাদা কোনো ইবাদত বা অনুষ্ঠান পালন করা জায়েয হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম এমন কোনো অনুষ্ঠান পালন করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের

আমানত পরিপূর্ণরূপেই আদায় করেছেন। মেরাজের রাতে যদি কোনো অনুষ্ঠান শরীয়তের অংশ হত, তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের তা জানাতেন।

বেদয়াতের আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, শবে বরাত পালন এবং কেবল ঐদিনই রোযা রাখা। অথচ এর স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল নেই। হযরত যায়েদ বিন আসলাম বলেন, আমরা আমাদের কোনো শায়েখ বা ফকীহদের ১৫ই শাবানকে আলাদা গুরুত্ব দিতে দেখিনি।

মুরতাদের পরিচয়

যে সব কারণে একজন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়, মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী হিসেবে গণ্য হয় উলামায়ে কেরাম কুরআন ও হাদীস থেকে এমন কিছু কারণ উল্লেখ করে থাকেন। তন্মধ্যে দশটি কারণ সবচেয়ে ভয়ানক ও মারাত্মক পর্যায়ে। যথা

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। যার বিস্তারিত বিবরণ ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে।
 ২. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোনো উসীলা গ্রহণ করা। তাদের কাছে দুআ বা প্রার্থনা করা, তাদের সুপারিশ কামনা করা এবং তাদের উপর আস্তা রাখা ও ভরসা করা।
 ৩. মুশরিকদেরকে কাফির সাব্যস্ত না করা বা তাদের কুফরীর বিষয়ে সন্দেহ করা কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে মনে করা। ইসলামকে একমাত্র সঠিক ধর্ম হিসেবে মনে না করা কুফরী।
 ৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর অনুসৃত পথ ও মতের চেয়ে অন্য কারো পথ, মত বা ফয়সালাকে বেশি উত্তম বা কল্যাণকর মনে করা। মানব রচিত আইনকে তাঁর আইনের ওপর প্রাধান্যদানকারী ব্যক্তিরও সন্দেহাতীত ভাবেই কাফির।
- তদ্রূপ যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ যে সব তত্ত্বমন্ত্র তৈরি করেছে এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে উত্তম বা সমকক্ষ কিংবা এরূপ মনে করে যে, সে সব আইন দ্বারাও ফয়সালা করা যেতে পারে কিংবা একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলাম অকার্যকর বা

অনুপোযোগী অথবা ইসলামের বিধান প্রয়োগ করতে গেলে মুসলমানদের মাঝেই বিভেদ উসকে দেয়া হবে কিংবা ইসলামের আইনে মানবজীবনের সার্বিক দিকের প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি, তাহলে এমন আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিও কাফির।

তদ্রূপ কেউ যদি মনে করে, চোরের শাস্তি হাত কাটা, বিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি প্রস্তরযোগে হত্যা করা; শরীয়তের এ বিধানগুলো এ যুগের জন্য প্রযোজ্য বা প্রয়োগযোগ্য নয়, তাহলে সেও কাফির।

তদ্রূপ যারা মনে করে, লেনদেন বা দণ্ডবিধিতে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইন গ্রহণের অবকাশ আছে তারা কাফির। কারণ এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ যা হারাম ঘোষণা দিয়েছেন তাকে হালাল মনে করছে। আর যে সব কাজ শরীয়তের সুস্পষ্ট ভাষ্যমতে হারাম, সেগুলোকে হালাল মনে করা কুফরী। আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফয়সালা করাও সর্বসম্মত মতানুসারে কুফরী।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন বা তিনি যার উপর আমল করেছেন, এমন কিছু প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করা কুফরী। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অর্থাৎ এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সে কারণে আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন। [সূরা মুহাম্মাদ- ৯]

৬. দ্বীনের কোনো বিষয়, সওয়াব বা শাস্তির কোনো বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কুফরী। কারণ ইরশাদ হয়েছে-

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ.

অর্থাৎ আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলে দেবে, আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাসা করছিলাম; তুমি বলে দাও, তবে কি তোমরা আল্লাহ; তাঁর আয়াতসমূহ এবং

তার রাসূলের প্রতি হাসি-তামাশা করছিলে? তোমরা ওয়র আপত্তি প্রদর্শন কর না, তোমরা তো ঈমান কবুলের পর কুফরী করেছ; যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই, কারণ তারা অপরাধী ছিল। [সূরা তওবা: ৬৫-৬৬]

৭. জাদু করা বা জাদুর প্রতি সমর্থন থাকা কুফরী। কারণ কুরআন বলছে-

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তারই অনুসরণ করেছে এবং সুলাইমান কুফরী করেননি, কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদুবিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারুত-মারুতের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত এবং তারা উভয়ে কাউকে এটা শিক্ষা দিত না, যে পর্যন্ত তারা না বলত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ। অতএব তুমি কুফরী কর না; অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করত এবং তারা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন করতে পারত না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করেছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোনো উপকার সাধিত হয় না এবং নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনোই অংশ নেই এবং তদ্বিনিময়ে তারা যে আত্ম-বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা তা জানত! [সূরা বাকারা : ১০২]

৮. মুসলমানদের বিপরীতে কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করা বা তাদের সহযোগিতা করা কুফরী। কারণ আল্লাহ বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পরের বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। [সূরা মায়দা- ৫১]

৯. ব্যক্তি বিশেষের জন্য দ্বীন-শরীয়ত বহির্ভূত আমলের অবকাশ রয়েছে মনে করা কুফরী। যেমন হযরত মুসা আ.এর দ্বীন থেকে খিজির বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানেও মনে করা হয়, সুফী-সাধকরা সাধনার এক পর্যায়ে শরীয়তের হুকুমের উর্ধ্বে চলে যান। এরূপ মনে করা কুফরী। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থাৎ আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবন ব্যবস্থা করে তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না। অতএব পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান- ৮৫]

১০. দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। দ্বীন জানেও না, মানেও না; এমন ভ্রক্ষেপহীন থাকা কুফরী। কারণ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। [সূরা সাজদা- ২২]

শেষ ফরিয়াদ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমার! আসুন আমরা আল্লাহর আহবানে সাড়া দিই। তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করি। তাহলে তিনি আমাদের গোনাহ মাফ করে দিবেন। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করবেন।

আল্লাহর কসম! আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। এ সত্য আশা করি আপনার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আপনি বুঝতে পারবেন, ধর্ম আসলে অনেকগুলো নয়। আল্লাহর মনোনীত ধর্ম একটি। আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর পূর্বাপর কিছু নেই। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা তিনি বরদাশত করেন না। কাজেই দিনশেষে আপনি যেন তাদের দলভুক্ত না হন, যারা বলে আমরা আমাদের বাপদাদাদের একটি ধর্ম ও নীতিতে প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব, বরং আপনি বলুন! ‘আমি তাওহীদে বিশ্বাসী। আল্লাহর একক ক্ষমতার প্রতি আমি অনুগত। কবরপূজারী বা মুশরিকদের আধিক্যে আমি প্রবঞ্চিত নই।’

মাযারীদের গল্পকাহিনী আর আজব কারামতের বাগড়ম্বরায় আপনি মুগ্ধ বা বিষন্ন হবেন না। আপনি নবীজির চাচা আবু তালেবের দিকে লক্ষ্য করুন! যিনি স্বীকার করতেন, নবীজি সত্যনবী। ইসলাম সত্যধর্ম। তিনি মূর্তিপূজাও পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সব সময় দ্বিধায় থাকতেন। কী করবেন? ভেবে পেতেন না, কিন্তু পূর্বপুরুষদের বিরোধীতার শঙ্কা ও বন্ধুদের তিরস্কারের মুখলজ্জা তার ঈমান আনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দেখুন! তার দিকে তাকিয়ে, তিনি যখন মৃত্যু শয্যায়। বিছানায় শোয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শিয়রে দাঁড়িয়ে তার চোখের পানি মুছছেন আর বলছেন, চাচাজান! বলুন! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বলুন! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তার পাশে কাফির কুরাইশ নেতৃবৃন্দও উপস্থিত। তিনি যখনই কালেমা বলতে চাচ্ছেন, কাফিররা তাকে এই বলে বাধা দিল, তুমি কি তোমার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার তাকে কালেমা পড়ার তাকিদ দিচ্ছিলেন আর ওদিকে কাফিররা তাকে বাপদাদার ধর্মে অটল থাকতে উৎসাহ দিচ্ছিল। শেষাবধি তিনি স্বীয় বাপদাদার ধর্ম, মূর্তিপূজা ও আল্লাহর সাথে শরীক করার ওপরই অটল থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় নিলেন। জাহান্নামকে তার ঠিকানা

বানালেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম মূর্তি ধ্বংসকারী, খানায়ে কাবার নির্মাতা হযরত ইবরাহীম আ.এর প্রতি লক্ষ্য করুন! যিনি আল্লাহর জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আল্লাহর পথে কষ্টে নিপতিত হয়েছিলেন। কিয়ামতের দিন তাঁর পিতাকে তিনি বাঁচাতে পারবেন না। তাকে কোনো উপকার করতে সক্ষম হবেন না। কারণ তাঁর পিতা মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম আ.এর সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাত হবে। আযরের চেহারা অন্ধকার ও ধুলোয় ধুসরিত থাকবে। ইবরাহীম আ. স্বীয় পিতাকে দেখে বলবেন, আমি কি আপনাকে অবাধ্যতা করতে নিষেধ করিনি? পিতা তাঁকে বলবে, আজ আমি তোমার অবাধ্য হব না। তখন ইবরাহীম আ. আল্লাহ তাআলাকে বলবেন, হে আল্লাহ! আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, পুণরুত্থান দিবসে আপনি আমায় লাঞ্চিত করবেন না। আমার পিতা জাহান্নামী হবেন এর চেয়ে লাঞ্ছনা আর কী আছে? আল্লাহ তাআলা জবাব দিবেন, ‘আমি জান্নাতকে কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছি।’

কাজেই সাবধান! সতর্ক হয়ে যান! সেদিন কোনো আত্মীয়তা বা পীর-মুরিদীর সম্পর্ক কোনো কাজে আসবে না। ইরশাদ হয়েছে-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.

অর্থাৎ সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজের ভাই হতে, এবং তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। [সূরা আবাসাঃ ৩৪-৩৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

অর্থাৎ যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে। [সূরা শুআরাঃ ৮৮-৮৯]

আসুন হকের পথে চলি। অপরকেও এ মর্মে নসীহত করি। আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি সকলকে আহ্বান জানাই। সকলের হেদায়েত ও সঠিক পথের দিশা নসীব হোক, কায়মনোবাক্যে সেই প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

মিনারের কান্না

الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا و صرفهم كيف شاء عزة و اقتدارا و أرسل
الرسول الى الناس اعتذارا فتم بهم نعمته السابقة و أقام بهم حجته البالغة فنصب
الدليل و أنار السبيل و أقام الحجة وأوضح المحجة فسبحان من أفاض على عباده
النعمة و كتب على نفسه الرحمة أحمده و التوفيق للحمد من نعمه و أشكره على
مزيد فضله و كرمه.

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض و السماوات و
فطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة و نصبت القبلة و لأجلها
جردت سيوف الجهاد و بها أمر الله سبحانه جميع العباد وأشهد أن محمدا عبده
و رسوله أرسله رحمة للعالمين و قدوة للعالمين أرسله بشيرا و نذيرا وداعيا الى الله
بأذنه و سراجا منيرا و أمدته بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه
كتابه المبين.

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহর ভয়ে ভীত নর-নারীদের আলোচনায় কিছু সময় ও কিছু ভাবনা
আমি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। কিছু দাওয়াত আমি
নিশ্চিত করতে চাই। কিছু চোখের পানি আজ মুছতে চাই। মিনারের কান্নার
কথা, নামাযের কথা আপনাদের হৃদয়পটে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

আমি মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়েছি। সকাল-সন্ধ্যা মিনার থেকে অশ্রু গড়িয়ে
পড়তে দেখেছি। আশ্চর্য! মিনার আবার কাঁদতে পারে? হ্যাঁ, মিনারও কাঁদে।
মিহরাবগুলো নিঃশব্দে কান্না করে। মসজিদগুলো চিৎকার করে কান্না করে।
এই আসমান কাঁদে। যমীন কাঁদে। নেককার বান্দা-বান্দীদের বিদায় ও
শূন্যতায় পাষাণ পাহাড়ও কাঁদে!

নামাযীরা যখন নামায ছেড়ে দেয়, বিনয়ীরা যখন বিনয়কে বর্জন করে,
ক্রন্দনকারীরা যখন কান্নাকে বিদায় জানায় তখন সবাই কাঁদে। দুনিয়াবাসীরা

যখন আল্লাহর যিকিরকে ভুলে যায়, তাঁর নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করে তখন সবাই কাঁদে। কে এই প্রকৃতির চোখের পানি মুছে দিবে? কে তার পেরেশানী দূর করবে? পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

অর্থাৎ যেসব গৃহকে সমুন্নত করতে এবং তাঁর নামের যিকির করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; সেসব লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে আল্লাহর যিকির হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখতে পারে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। [সূরা নূরঃ ৩৬-৩৭]

নামাযের গুরুত্ব

নামায হচ্ছে একাত্মবাদীদের চোখের মণি। প্রেমিকদের হৃদয়ের স্পন্দন। নামায হচ্ছে আবেদনের উদ্যান, মুখলিসদের প্রতিদান। মুমিনদের হৃদয়ের বাগান, আত্মার খোরাক ও দেহের পরিচর্যা। এর মাধ্যমেই তারা নিয়ামতের শোকরিয়া জানায়। নামাযের মাধ্যমেই মাটিতে পা রেখেও বান্দা আরশের মালিকের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়।

নামায এমন একটি ইবাদত যাকে আল্লাহ তাআলা সকল আমলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। নামাযীকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সর্বশেষ অসিয়ত ছিল এই নামায সম্পর্কে। কিয়ামতের আগে ইসলামের সর্বশেষ যে বিধানটি নিশ্চিহ্ন হবে তা হচ্ছে নামায। হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তুও হবে নামায।

নামায ও মেরাজ

নামায ইসলামের অন্যতম রুকন। ইসলামের মহান একটি ভিত্তি। নামাযের এই মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটা ফরয করার জন্য আল্লাহ তাআলা খাতিমুল আশ্মিয়াকে আকাশের উপরে তুলে নিয়ে তারপর একে ফরয সাব্যস্ত করে নামাযীদের জন্য মহা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসরা ও মেরাজের ঘটনার বিবরণে ইরশাদ করেন,

فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعِمَّ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلِّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْبَائِنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبْقَهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيْلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتُ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ،

فَرَجَعْتُ فَأَمَرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمِ
أَمَرْتُ؟ قُلْتُ: أَمَرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ
الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأَمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى
اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ
فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي".

“জিবরাইল আমাকে নিয়ে প্রথম আকাশে গিয়ে তার দুয়ার খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? জিবরাইল উত্তর দিলেন, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জবাব দিলেন, হ্যাঁ। বলা হল, ‘তাঁকে স্বাগতম। তিনি কতই না উত্তম আগন্তুক।’ তারপর আকাশের দুয়ার খুলে দেয়া হল। এভাবে সপ্তম আকাশে পৌঁছার পর একই প্রশ্নোত্তর পর্বের পর সেই আকাশের দুয়ারও খুলে দেয়া হল। সেখানে আমি হযরত ইবরাহীম আ.কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল পরিচয় করিয়ে দিলেন, ‘ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম আ.। তাঁকে সালাম দিন।’ আমি সালাম দিলে তিনি উত্তর দিলেন এবং আমাকে তাঁর সন্তান ও একজন নবী হিসেবে স্বাগত জানালেন। এরপর আমি সিদরাতুল মুনতাহায় আরোহিত হলাম। আমার ও আমার উম্মতের ওপর প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে ফরয করা হল। আমি ফিরতি পথে হযরত মুসার পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কিসের আদেশ দেয়া হয়েছে? বললাম, প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, ‘আপনার উম্মত এত নামায পড়তে পারবে না। আপনি কমিয়ে আনুন।’ আমি ফিরে গেলাম; ফলে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হল। ফিরতি পথে মুসা আ. আবারো জিজ্ঞেস করে আমায় আবার ফেরত পাঠালেন। তখন আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হল। এভাবে বারবার যাওয়া-আসায় পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ পেলাম। শেষবার ফেরার পথে আবারো হযরত মুসার সাথে দেখা হলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা জেনে বললেন, আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্তও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ইতিপূর্বে মানুষকে নিয়ে

চলেছি। বনী ইসরাইলের প্রতিকারের অনেক চেষ্টা করেছি। আপনি ফিরে গিয়ে আপনার উম্মতের জন্য আরো কমিয়ে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কাছে কমানোর আবেদন করতে করতে আমি এখন ভীষণ লজ্জিত। তাই আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই সম্ভ্রষ্ট এবং এটাই মেনে নিলাম। এরপর পথ অতিক্রম কালে গায়েব থেকে ঘোষণা শোনা গেল, আমি আমার ফরযকে চূড়ান্ত করেছি এবং আমার বান্দাদের জন্য তা সহজবোধ্য করেছি।” [সহীহ বুখারী- ৩৮৮৭]

সুতরাং মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বর্ণনা করুন যিনি আমাদেরকে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর কাছে আত্মনিবেদনের তাওফীক দিয়েছেন। প্রয়োজনাদির আর্জি পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন।

নামাযেই ইবরাহীম আ.এর মুক্তি

নামায হচ্ছে যমীনের গোলাম ও আরশের মালিকের মাঝে বন্ধন ও মোলাকাত। দাসত্ব ও ওয়াদা পূরণ। নামায এমন সহযোগী যা কখনো হারিয়ে যায় না। এমন পাথেয় যা নিঃশেষ হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর অভ্যাস ছিল, কোনো বিষয়ে তিনি পেরেশান হলে তৎক্ষণাত নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। দুঃখ-কষ্ট দূর করা ও দুআ কবুলের ক্ষেত্রে নামাযের কোন তুলনা হয় না। নেককারগণের কাছে বিপদে-মসীবতে, দুআ বা প্রার্থনায় নামাযই হচ্ছে অবলম্বন।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, একবার হযরত ইবরাহীম আ. স্বস্ত্রীক সফর করতে করতে এক সৈরাচার বাদশাহর এলাকায় চলে এলেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে বাদশাহর এক অনুচর বাদশাহর কাছে গিয়ে কুমন্ত্রণা দিল, আপনার এলাকায় এক অচেনা মুসাফির অনিন্দ্য সুন্দরী এক রমণীসহ আগমন করেছে। অথচ এমন রূপবতী রমণী কেবল আপনার সাথেই মানায়।

অনুচরের প্ররোচনায় বাদশাহের মনে কামভাব জেগে ওঠল। বাদশাহ খোঁজ নেয়ার জন্য তৎক্ষণাত একদল সৈন্য পাঠাল। তারা এসে ইবরাহীম আ.কে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে নারীটি কে?

ইবরাহীম বুঝতে পারছিলেন এই বাদশাহর সামনে তাঁর একার সামান্য শক্তিতে কোনো কাজ হবে না। তিনি এও অনুভব করলেন যে, যদি বাদশাহর সৈন্যদের কাছে সত্য প্রকাশ করে দেন তাহলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। তাই তিনি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে জবাব দিলেন, সে আমার বোন। তারপর তিনি স্ত্রী সারার কাছে এসে বললেন, 'হে সারা! বর্তমান পৃথিবীতে মুমিন কেবল আমরা দু'জনই। বাদশাহের লোকেরা আমাকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছে। বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে আমার বোন বলে পরিচয় দিয়েছি। কাজেই তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তুমি আমাকে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত কর না।'

বাদশাহের আদেশে সারাকে প্রাসাদে ধরে আনা হল। তাঁকে অন্দর মহলে নিয়ে বাদশাহ হীন উদ্দেশ্য চারিতার্থ করার জন্য যখন তাঁর প্রতি হাত বাড়াল সাথে সাথে বাদশাহের হাত প্যারালাইসিস হয়ে গেল। এতে বাদশাহ ভয় পেয়ে গেল। সে হাতজোড় করে সারাকে অনুরোধ করল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ কর; আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তার সরল কথায় বিশ্বাস করে সারা দুআ করলে বাদশাহের হাত স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে সে আবার সারার প্রতি হাত বাড়াল। এবারও তার হাত প্যারালাইসিস হয়ে গেল। বাদশাহ বুঝতে পাল যে, কোনোভাবেই এই রমণীর মাধ্যমে নিজের কামবাসনা চারিতার্থ করা সম্ভব নয় এবং এই রমণী সাধারণ কোনো রমণী নয়, তখন কাকুত-মিনতি করে মাফ চাইতে লাগল। বলল, শেষবারের মতো আমাকে মাফ কর এবং আল্লাহর কাছে দুআ কর; এরপর আমি তোমার আর কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করব না।' সারা পুনরায় তার জন্য দুআ করলে সে সুস্থ হল। বাদশাহ এবার চরমভাবে ভয় পেল। রক্ষীদেরকে ডেকে বলল, তোমরা কাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ? এরা তো মানুষ নয়, অন্য কিছু। এই বলে হাজারো নামীয় এক বাদী হাদিয়া দিয়ে সারাকে পূর্ণ সম্মানে প্রাসাদ থেকে বিদায় জানাল।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সারা স্বামী ইবরাহীমের কাছে এলেন। এসে তাঁকে নামায, দুআ ও ক্রন্দনরত পেলেন। ইবরাহীম আ. যখন অনুভব করলেন যে, সারা ফিরে এসেছেন তখন তাঁকে হাতের ইশারায় করে খবর জানতে চাইলেন। সারা জবাব দিলেন, আল্লাহ তাআলা কাফেরের অসদুদ্দেশ্যকে

নস্যাৎ করে দিয়েছেন। উপরন্তু হাজেরাকে খাদেমা হিসেবে উপহার দিয়েছেন।

বিপদগ্রস্ত হযরত ইবরাহীম আ.কে দেখুন! বিপদাক্রান্ত হওয়ার পর কিভাবে তিনি নামাযমুখী হয়েছেন। লক্ষ্য করুন হযরত যাকারিয়া আ.কে! সন্তর পেরুনো এক বয়োবৃদ্ধ। দেহ দুর্বল হয়ে গেছে। হাড়ি ক্ষয় হয়ে গেছে। আশা-আকাজ্জা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ সময় তাঁর দিলে একজন সন্তান বা উত্তরসুরীর বাসনা তীব্র হয়ে ওঠল। আল্লাহর কাছে হাত তুলে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করলেন। পবিত্র কুরআনে সেই ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

অর্থাৎ এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহবান করেছিলেন নিভৃতে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গিয়েছে, বার্ধক্যে আমার কেশ শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার রব! আপনাকে আহবান করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। আমি ভয় করি আমার পর উত্তরাধিকারীত্বের, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং আপনি আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার রব! তাকে করুন সন্তোষজনক। [সূরা মারয়াম: ২-৬]

তাঁর ফরিয়াদে আকাশের দুয়ার কেঁপে উঠল। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি ফেললেন। হযরত যাকারিয়া যখন মিহরাবে রবের এহসানের প্রতীক্ষায়, আযাবের ভয়ে ভীত নামাযে দাঁড়িয়ে, সেই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। ইরশাদ হয়েছে-

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَتَى يَكُونُ لِي
غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

অর্থাৎ অতঃপর যখন তিনি মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন- তাঁর অবস্থা এই হবে যে, তিনি আল্লাহর বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন। নেতা হবেন, স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুন দমনকারী হবেন এবং তিনি সৎকর্মশালী নবীদের একজন হবেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? আমার তো বার্ষিক্য উপস্থিত হয়েছে ও আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; ফেরেশতা জবাব দিলেন, এভাবেই দিবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। [সূরা আলে ইমরান: ৩৯-৪০] এভাবেই নামাযের মাধ্যমে রহমতের ধারা নামে।

বিপদে-মসীবতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায

আহযাব যুদ্ধের প্রাক্কালে উৎকণ্ঠায় মুসলমানদের প্রাণ যখন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। মুনাফিক ও পাপীর দল একে একে সব ময়দান ত্যাগ করল। মুসলমানরা তাদের ও শত্রুদের মাঝে পরিখা খনন করল। রাত গভীর হল। প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ শুরু হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের তথ্য জানার আশ্রয় পোষণ করলেন। সাহাবায়ে কেরামের কাছে এসে বললেন, কে আছ এমন যে কাফিরদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের তথ্য আমার কাছে নিয়ে আসবে আর জান্নাতে আমার সাথে থাকবে? কেউ দাঁড়াল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে বললেন ‘হুয়াইফা! দাঁড়াও’। হুয়াইফা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করার পর আমার না দাঁড়িয়ে কোনো উপায় ছিল না। হুযুর ডাকলে আমি আওয়াজ দিলাম, লাঝাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও। কাফিরদের মাঝে গিয়ে তাদের তথ্য নিয়ে এসে আমাকে জানাও। খবরদার! আমার কাছে আসার আগে কাউকে কিছু বলবে না বা কিছু করবেও না।

হুয়াইফা বলেন, তারপর আমি অন্ধকারের মাঝে পরিখার এদিক দিয়ে নেমে ওদিক দিয়ে উঠলাম। দেখলাম, মুশরিকদের বিশাল কাফেলা উপস্থিত। তাদের মাঝখানে বসে একজন হাত বাড়িয়ে আগুনে পোহাচ্ছে। আর হাত দুই পাশে চেপে ধরছে। খেয়াল করে দেখলাম, আরে! এতো কাফিরদের দলপতি আবু সুফিয়ান! মনে মনে ভাবলাম, এই সুযোগে আমি যদি আবু সুফিয়ানকে হত্যা করে ফেলতে পারি তাহলে কাফিরদের মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে এবং তারা পরাজিতও হবে। এই ভেবে আমি তূণীর থেকে সাদা পাখা বিশিষ্ট একটি তীর বের করে তা ধনুকে স্থাপন করলাম। তারপর শক্ত করে তীর টেনে ধরতেই আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কথা মনে পড়ল ‘আমার কাছে আসার আগে কাউকে কিছু বলবে না বা কিছু করবে না।’ তাঁর আদেশ মনে পড়তেই আমি তৎক্ষণাত তীরটি তূণীতে রেখে দিয়ে চুপচাপ মুশরিকদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। রান্নার হাড়ি-পাতিল উল্টে যাচ্ছিল। উটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। এরপর আমি একটি তাবুতে প্রবেশ করে তাদের সাথে অন্ধকারে বসে গেলাম। ইত্যবসরে আবু সুফিয়ান অনুভব করল, কেউ একজন সৈন্যদলের মাঝে ঢুকে পড়েছে। সে চিৎকার দিয়ে সকলকে বলল, প্রত্যেকেই তার পাশে কে খেয়াল কর। হুয়াইফা বলেন, আবু সুফিয়ানের ঘোষণা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার পাশের লোক আমাকে জিজ্ঞেস করলে তো আমি ধরা পড়ে যাব। ফলে আমিই তাকে আগে প্রশ্ন করে বসলাম, এই কে তুমি? ঐ লোক ভয় পেয়ে গেল। ধরা গলায় বলল, আমি অমুক গোত্রের অমুক। তারপর আমি চুপ হয়ে গেলাম। ঐ লোক আমার হাবভাব দেখে আমাকে আর পরিচয় জিজ্ঞেস করার সাহস করল না। ফলে আমি বেঁচে গেলাম।

তারপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে ফিরে এলাম। এসে দেখি, রাসূলুল্লাহ নামায ও দুআয় মশগুল। তিনি নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে বসে রইলাম। নামায শেষে তাঁকে কাফিরদের সার্বিক অবস্থা অবহিত করলাম। তিনি খুবই খুশি হলেন এবং উচ্ছসিত কণ্ঠে নারায়ে তাকবীর দিলেন।

এভাবেই আল্লাহ তাআলা নামায ও দুআর বদৌলতে তাঁর আপনজনদের সাহায্য করে কাফিরদের পরাজিত করেন। সেই ইতিহাস আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনেও আলোচনা করেছেন,

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে তাদের পূর্ণ ক্রোধ সহকারে ফিরিয়ে দিবেন। তারা কোনো কল্যাণই অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। [সূরা আহযাব- ২৫]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সেই কঠিন মসীবতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নামাযমুখীই হয়েছেন। ফলে মসীবতও দূর হয়ে গেছে।

মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার নামায

মুসলিম ইতিহাসের বিখ্যাত সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিমের সেনাদলের সাথে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসেও জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শত্রু সৈন্যদলের মুখোমুখী হলে কুতাইবা লক্ষ্য করলেন, মুহাম্মাদ ময়দানে নেই। তিনি কয়েকজনকে তাঁকে খুঁজতে পাঠালেন। ফিরে এসে তারা জানাল, আমরা তাকে নামাযে সিজদাবস্থায় পেয়েছি। নামায শেষে হাত উঠিয়ে দুআ করতে দেখেছি। কুতাইবা বললেন, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসের দুআর হাত আমার কাছে হাজারো দুঃসাহসী যুবক ও জানবাজ মুজাহিদের জিহাদের চেয়ে প্রিয়। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে জিহাদের ময়দানে ফিরে এলে কুতাইবা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার জন্য আকাশের দুয়ারে আলোড়ন সৃষ্টি করছিলাম।

এই নামাযের দাসত্ব ছেড়ে আজ কোথায় রোগীরা? এই রুকু ও সিজদা ফেলে কোথায় বিপদগ্রস্তরা? মাজলুম ও অভাবীরা কেন আজ নামায ছেড়ে দিল? নামাযের দ্বারাই তো রোগী রোগমুক্তি লাভ করবে। এর দ্বারাই বিপদগ্রস্তের আপদ দূর হবে। গোনাহগারের গোনাহ মাফ হবে। তওবাকারীর তওবা কবুল হবে। কাজেই নামাযের মাধ্যমে আকাশের দুয়ার কাঁপিয়ে তুলুন। বিপদ থেকে নিরাপদ ও কষ্ট থেকে দূরে থাকুন।

জাগতিক প্রয়োজনেও নামায

নামায হচ্ছে রিযিকের চাবি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُمَدَّنْ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ.

অর্থাৎ আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে যা দিয়েছি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো সেদিকে প্রসারিত কর না, তোমার রবের প্রদত্ত জীবনোপকরণ অধিক উত্তম ও স্থায়ী। আর তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও ও তাতে নিজে অবিচল থাক, আমি তোমার নিকট হতে জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যে। [সূরা ত্বহা: ১৩১-১৩২]

একবার এক অভাবী ব্যক্তি একজন আমীরের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব নিয়ে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাবেত বুনাতির কাছে এল। তিনি লোকটিকে নিয়ে আমীরের বাড়ির উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন। পথিমধ্যে যে মসজিদই পড়ত সাবেত রহ. সেখানে থেমে দু'রাকাত নামায পড়তে লাগলেন। তারপর ঐ আমীরের বাড়িতে পৌঁছে তাকে প্রয়োজনের কথা বলতেই তিনি তাৎক্ষণিক তা সমাধা করে দিলেন।

কাজ হয়ে যাওয়ার পর সাবেত লোকটিকে বললেন, হযরত সব মসজিদে থেমে আমার দু' দু' রাকাত নামায আদায় তোমাকে কষ্ট দিয়েছে? সে বলল, হ্যাঁ, বাস্তবেই কষ্ট দিয়েছে। সাবেত বললেন, আমি প্রতি মসজিদে নামায পড়ে আল্লাহর কাছে কেবল তোমার মাকসাদ হাসিলের জন্যই দুআ করেছি। নামাযের বরকতেই আল্লাহ তাআলা তোমার মাকসাদ পূরণ করলেন।

নামায হচ্ছে রহমতের দুয়ার, বরং তা একটি অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের চাবি। কাজেই যে ব্যক্তি নামায হাসিল করতে পারল সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করল।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই সকল বান্দার প্রতি রহম করুন যারা তাদের মুবারক কদমকে তাঁর আনুগত্যে নামাযে দাঁড় করিয়ে রাখেন। ফলে তাদের

আমলে সন্তুষ্ট হয়ে তিনিই আবার তাদের দ্রুত সুসংবাদ দান করেন। সেই মহামনীষীদের দিবানিশি নামাযের বহু বিবরণ কুরআন-হাদীসে এসেছে। পবিত্র কুরআনে তাদের রাতের নামাযের বিবরণ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে-

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থাৎ তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে আশঙ্কায় ও আশায় এবং তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। [সূরা সিজদা: ১৬-১৭]

আর অন্যত্র এসেছে দিনের বিবরণ-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুমিনরা এরূপ হয় যে, যখন আল্লাহর স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। তারা নামায কায়েম করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্যেই রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদা, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। [সূরা আনফাল: ২-৪]

নামাযের দ্বারাই রহমতের দুয়ার খুলে, আরশের পর্দা উঠে। যমীন যখন শুকিয়ে যায়, আকাশ থেকে বৃষ্টির ধারা যখন বন্ধ হয়ে যায়, ধন-সম্পদ যখন ক্ষয় হয়ে যায়, পরিবারের লোকজন যখন ক্ষুধায় দিন কাটায় তখন নামাযই মূলমন্ত্র। বান্দা যখন কোনো বিষয় নিয়ে ভাবে, কোনো বিষয় নিয়ে দিধাদ্বন্দ্বে ভোগে নামাযই তখন ভরসা। তখন সে ইস্তিখারার নামায আদায়

করে। পাপী যখন পাপ করে, তখন নামায। কোনো বিষয় কষ্ট পেলে, তখনো নামায। সূর্য বা চন্দ্রগহনের সময়ও নামায। নামায হচ্ছে সকল পুণ্যের আধার। সবচেয়ে ঈর্ষণীয় ইবাদত। নামায নেককার বান্দাদের আত্মার প্রশান্তি। মুত্তাকীনের চোখের মণি। বান্দা যখন নামাযে যত্নবান ও মনোযোগী হয়, সময় হতেই দ্রুত নামাযের দিকে ধাবিত হয় এবং নামাযেই প্রাণ খুঁজে পায়, আল্লাহর রহমতও তখন সন্নিবিষ্ট হয়। আল্লাহর দয়ায় সে তখন সিক্ত হয়।

ইমরান তনয়া মারয়ামকে দেখুন! সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নারীদের মধ্য থেকে পূর্ণতা পেয়েছেন কেবল ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও ইমরান তনয়া মারয়াম।’ মারয়ামের এই পূর্ণতার রহস্য কী? হযরত মারয়াম ছিলেন নামাযী। সব সময় মিহরাবের পাশে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই আমলের প্রতিদান হিসেবে তাঁকে ও তাঁর সন্তানকে বিশ্বাসীর জন্য সত্যের প্রতীক মনোনীত করেছেন। তাঁর থেকে নবীর জন্ম দিয়েছেন। যারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন। তাঁকে তাঁর কর্মের প্রতিদানের কথা জানানো হলে তিনি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে নামায ও অন্যান্য ইবাদতের পরিমাণ আগের চেয়েও বাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ.

অর্থাৎ এবং যখন ফেরেশতাগণ বলেছিলেন হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং বিশ্বজগতের নারীগণের ওপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারয়াম! তোমার রবের ইবাদত কর এবং সিজদা কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর। [সূরা আলে ইমরান: ৪২-৪৩]

অন্যায় প্রতিরোধে নামায

নামায নামাযীকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। আপনি যাকেই ইবাদতে আগ্রহী, নামাযে উৎসাহী পাবেন, দেখবেন! সে যাবতীয় ভাল

কাজের প্রতিই সমান ধাবিত। পাশাপাশি খারাপ কাজ থেকে সে বহুদূরে।
আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ.
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.

অর্থাৎ মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অস্থির চিত্তরূপে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ; তবে নামাযীরা এমন নয়, যারা তাদের নামাযে সदा নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বকারী। [সূরা মাআরিজ: ১৯-২৩]

হযরত শুআইব আ. যখন স্বজাতিকে ঈমান আনতে এবং মাপ-পরিমাপে ইনসাফ বজায় রাখতে অনুরোধ করলেন তখন তাঁর জাতি বুঝতে পারল যে, তাঁর নামাযই তাকে এহেন অন্যায় থেকে বারণ করতে অনুপ্রাণিত করছে-

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ.

অর্থাৎ তারা বলল, হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে আমরা ঐসব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছে ধৈর্যশীল ও নেককার। [সূরা হুদ- ৮৭]

সিজদার মাহাত্ম্য

রুকু ও সিজদা নামাযের শ্রেষ্ঠতম রুকন। সকল আমলের মাঝে নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব ও নামাযের আমলসমূহের মাঝে রুকু-সিজদার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম একটি প্রমাণ হচ্ছে, কিয়ামতের দিন রুকু-সিজদার বদৌলতেই সমস্ত মাখলুক থেকে সর্ববৃহৎ মসীবতটি দূর হয়ে যাবে। যেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ সমবেত হবে, সাদা-কালো, বড়-ছোট, আরবী-অনারবী সকলে একত্র হবে, অপেক্ষার পালা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে, সকলের দৃষ্টি

বিস্ফোরিত হবে, ঘামে সকলে নেয়ে ওঠবে, ভয় ও আতঙ্ক চরম আকার ধারণ করবে, সেদিন আরশের নিচে রাব্বুল আলামিনের সকাশে রাহমাতুল্লিল আলামিনের প্রদত্ত একটি সিজদার বদৌলতেই সমস্ত পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে।

সহীহ বুখারী-মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে এক যমীনে সমবেত করবেন। সূর্য মাথার নিকটবর্তী হবে। দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যা সহ্য করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। পরিস্থিতি যখন চূড়ান্ত ভয়ানক আকার ধারণ করবে। সবাই চাইবে, ফয়সালার পরিণতি ভাল-মন্দ যাই হোক, আল্লাহ তাআলা দ্রুত ফয়সালা করে দিন। একে অপরকে বলতে থাকবে, দেখছ না কত ভয়ানক অবস্থায় আছ? আর কী বা হবে? এমন কাউকে কী পাওয়া যায় না যিনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন? কে হতে পারে তিনি? কিছু লোক বলবে, আমাদের সকলের পিতা আদম আ.এর কাছে চল। সকলে হযরত আদম আ.এর কাছে এসে বলবে হে আদম! আপনি আমাদের সকলের পিতা। আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতী হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে তাঁর রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের আপনাকে সিজদা করতে বলেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী ভয়ানক সময় অতিক্রম করছি? আদম আ. বলবেন, আমার রব আজ যে পরিমাণ রেগে আছেন কখনো তিনি এমন রাগ করেননি। ভবিষ্যতেও কখনো তিনি এত রাগ করবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর আদেশের অবাধ্য হয়েছি। আজ আমি নিজেকে নিয়েই পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।

লোকেরা হযরত নূহ আ.এর কাছে গিয়ে বলবে, হে নূহ! আপনি জমীনবাসীর প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দুরাবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না আমরা কী ভয়ানক সময় অতিক্রম করছি?

হযরত নূহ আ. জবাব দিবেন, আজ আমার রব এত রাগ হয়েছেন, তিনি অতীতে কখনো এত রাগ হননি। ভবিষ্যতেও হবেন না। আমার যদি দু'আর কোনো সুযোগ থাকে, তাহা আমার জাতির বিরুদ্ধে বদদু'আ করার মাধ্যমে সম্পাদন করেই ফেলেছি। আমি এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। ইবরাহীমের কাছে যাও।

সকলে হযরত ইবরাহীম আ.এর কাছে গিয়ে বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহর নবী এবং জমীনবাসীদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না আমরা কী ভয়ানক সময় অতিক্রম করছি? ইবরাহীম আ. জবাব দিবেন, আজ আমার রব এত রাগ হয়েছেন তিনি অতীতেও কখনো এত রাগ হননি। ভবিষ্যতেও হবেন না। তারপর তিনি তাঁর দুনিয়াতে কিছু অসত্যের আশ্রয়ের বিবরণ দিয়ে বলবেন আমি আজ নিজের জন্য পেরেশান। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুসার কাছে যাও।

সকলে হযরত মুসা আ.এর কাছে এসে বলবে, হে মুসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাআলা গোটা মানব জাতির মধ্য হতে আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য নির্বাচিত করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না আমরা কী ভয়ানক সময় অতিক্রম করছি? মুসা আ. জবাব দিবেন, আমার রব এত রাগ হয়েছেন তিনি অতীতেও কখনো এত রাগ হননি। ভবিষ্যতেও হবেন না। আমি দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ ছাড়াই এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম। আজ হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচান। আমাকে বাঁচান। এভাবে হযরত মুসা আ.ও নিজের পেরেশানী ও অক্ষমতার কথা বলে বলবেন, তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। ইসার কাছে যাও। লোকেরা হযরত ইসা আ.এর কাছে গিয়ে বলবে, হে ইসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি তো আল্লাহর কালিমা ও রুহ। যা আল্লাহ তাআলা মারয়ামের মাঝে ফুঁকে দিয়েছিলেন। আপনি আল্লাহর তাআলার বিশেষ ইচ্ছায় মায়ের কোলে থাকাবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দুরবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না আমরা কী ভয়ানক সময় অতিক্রম করছি? ইসা আ. জবাব দিবেন, আমার রব এত রাগ হয়েছেন

তিনি অতীতেও কখনো এত রাগ হননি। ভবিষ্যতেও হবেন না। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদের কাছে যাও। তিনি নিজের কোন অপরাধের কথা বলবেন না।

রাসূলুল্লাহ বলেন, তারপর লোকেরা আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব কিছু মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের দুরাবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না আমরা কী ভয়ানক সময় অতিক্রম করছি? এরপর আমি আরশের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। আমি আমার রবের সিজদায় পড়ে যাব। তখন আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিবেন এবং আমার হৃদয়ে তাঁর এমন প্রশংসা ও বন্দনা ঢেলে দিবেন যা ইতিপূর্বে কখনো কারো জন্য তিনি উন্মুক্ত করেননি। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তুমি চাও। তোমাকে দেয়া হবে। সুপারিশ কর। তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে।

আমি বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মতকে আপনি বাঁচান। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতের মধ্য থেকে যাদের কোনো হিসাব নেই তাদের নিয়ে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। আর অন্য দরজা দিয়েও তোমার উম্মত অন্যদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। এরপর আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের মাঝে চূড়ান্ত হিসাব করবেন।

অযুর ফযীলত ও বেনামাযীর পরিণতি

এই মহা সুপারিশ, মহামুক্তি কেবল নামাযীদের জন্য হবে। বেনামাযীরা এ থেকে বঞ্চিত হবে। তারা এ সুপারিশ ও মর্যাদা লাভ করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.

অর্থাৎ সেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। আল্লাহর সাথে যার চুক্তি রয়েছে তারা ভিন্ন আর কেউ শাফাআতের অধিকার পাবে না। [সূরা মারয়াম: ৮৫-৮৭]

এই চুক্তি কোন চুক্তি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আমাদের ও অন্যদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (মুসনাদে আহমাদ)

কাজেই বেনামাযী কী করে সেই ভয়ংকর ও মহাবিপদের দিনে সুপারিশের আশা করতে পারে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের মাঝে তাঁর উম্মতকে চেনা যাবে অযুর আছর দ্বারা। বেনামাযীর মাঝে তো সেই আছর থাকবে না!

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমি আমার বন্ধুদের দেখতে চাই। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার বন্ধু নই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার সাথী। আমার বন্ধু তারা যারা এখনো আগমন করেনি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা এখনো আসেনি আপনি তাদের কী করে চিনবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তোমাদের অনেক কালো ও হলুদ ঘোড়ার মাঝে কারো ঘোড়ার চেহারায় যদি উজ্জল দাগ থাকে তাহলে সে কি তার ঘোড়া চিনবে না? তারা জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে অবশ্যই চিনবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মত সেদিন অযুর দরুণ উজ্জল চেহারায় গুপ্ত পায়ে আগমন করবে। অন্য কেউ তাদের মতো হবে না।

অদ্রুপ জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুপারিশের বেলায়ও ঘটবে। বেনামাযীর জন্য এই সুপারিশ মিলবে না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে সমবেত করবেন তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে ‘প্রত্যেক জাতি তার মাবুদের কাছে চলে যাও’ তখন ক্রুশের পূজারীরা ক্রুশের সাথে চলে যাবে। মূর্তিপূজারীরা মূর্তির সাথে যাবে। এভাবে প্রত্যেক জাতি তাদের মাবুদদের সাথে গমন করবে। কেবল তারাই রয়ে যাবে যারা আল্লাহর ইবাদত করত। তাদের কেউ ভাল।

কেউ মন্দ। আহলে কিতাবের অবশিষ্ট লোকেরাও থাকবে। তারপর জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে এমনভাবে উপস্থিত করা হবে যেন তা একটি মরীচিকা। জাহান্নামের ভয়াবহতা দর্শনে মানুষের মাঝে প্রচণ্ড তৃষ্ণা ও ভীতি ছেয়ে যাবে। এ সময় ইহুদীদের বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়েরের ইবাদত করতাম। বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোনো স্ত্রী বা সন্তান নেই। জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আমাদের পিপাসা নিবারণ করা হোক। জাহান্নাম তাদের সামনে মরীচিকার মতো থাকবে। জাহান্নামকে মনে হবে একটি জলাশয়। বলা হবে, এখান থেকে পান কর। তারা জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তারপর খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র ঈসা মসীহের ইবাদত করতাম। বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোনো স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আমাদের পিপাসা নিবারণ করা হোক। জাহান্নাম তাদের সামনে মরীচিকার মত থাকবে। মনে হবে সামনে বুঝি জলাশয়। বলা হবে, এখান থেকে পান কর। তারাও বিভ্রান্ত হবে। তারাও জাহান্নামকে পানির আধার মনে করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এরপর কেবল তারাই রয়ে যাবে যারা আল্লাহর ইবাদত করত। তাদের মাঝেও ভাল-মন্দ থাকবে। বলা হবে, তোমাদেরকে কে আটকে রেখেছে? সকলে তো চলে গেছে? তারা বলবে, আমরা ঘোষকের ঘোষণা শুনেছি 'প্রত্যেক জাতি যেন তার মাবুদের সাথে যুক্ত হয়'। তাই আমরা আমাদের রবের অপেক্ষায়। এরপর আল্লাহ তাআলা স্বরূপে আগমন করবেন। তখন সকল মুমিনগণ সিজদায় পড়ে যাবেন। যারা দুনিয়াতে নামাযের ব্যাপারে উদাসীন ছিল কিংবা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ত তারাও সিজদা করতে চাইবে, কিন্তু তাদের পিঠ সোজা হয়ে থাকবে। ফলে তারা চাইলেও সিজদা করতে সক্ষম হবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.

অর্থাৎ সেই দিন যেদিন হাঁটুর নিম্নাংশ উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্যে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে। [সূরা কলম: ৪২-৪৩]

সিজদার আলামত

দুনিয়ায় যারা নামায কায়েম করত তাদের যদি কোনো কারণে জাহান্নামেও যেতে হয় তবু তাদের জন্য সুপারিশ অত্যাসন্ন। কারণ আল্লাহ তাআলা যখন তার বান্দাদের মাঝে ফয়সালা শেষ করবেন। জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে। তখন যারা আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল তাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে খুশি জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন তাদেরকে বের করে আনতে। ফেরেশতারা এসে দেখবে কেউ আগুনের মাঝে ডুবে যাচ্ছে। কারো পা পর্যন্ত, কারো পায়ের অর্ধেক পিণ্ডলী পর্যন্ত ডুবন্ত। ফেরেশতারা খুঁজতে থাকবে। অবশেষে সিজদার আলামত দ্বারা তাদের চিনতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বনী আদমের সিজদার আলামতকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফেরেশতারা সেই আলামত দেখে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। [বুখারী, মুসলিম]

দুনিয়ায় যারা নামাযী ছিল কিয়ামতের দিন তাদের হালতই যদি নাযুক হয়, তাহলে অন্যদের সেদিন কী অবস্থা হবে? তাদের বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে-

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ. فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ. عَنِ الْمُخْرَجِينَ. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيُّومَ الدِّينِ. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ, তবে দক্ষিণপার্শ্বস্থ ব্যক্তির নয়, তারা জান্নাতে থাকবে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে সাকারে নিষ্ক্ষেপ করেছে?

তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদের খাবার দিতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, এখন সত্য সবকিছুই আমাদের নিকট দীপ্যমান। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না। (সূরা মুদাসসির : ৩৮-৪৮)

সুতরাং নামাযই হচ্ছে, জান্নাতের চাবি, দারুস সালামের পথ ও আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়ার সোপান। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের সময় বেলালকে বললেন, হে বেলাল! ইসলামে প্রবেশের পর তোমার সবচেয়ে আশাপ্রদ আমল কোনটি, আমাকে বল। কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। বেলাল জবাব দিলেন, আমি তো আশাপ্রদ কোনো আমল করিনি। তবে আমি যখন অযু করি তখনই সে অযু দ্বারা যথাসম্ভব নামায আদায় করি।

তাবরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রবীআ ইবনে কাব বর্ণনা করেন, আমি দিনের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করতাম। রাত হলে তাঁর দুয়ারের কাছে আশ্রয় নিতাম। সেখানেই রাত পার করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, হে রবীআ! তুমি আমার কাছে যা চাওয়ার চাও। আমি তোমাকে তাই দিব। আমি বললাম, আমাকে একটু ভাবার সময় দিন। মনে মনে ভাবলাম এই দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার আর কী বা চাইব? ভেবে চিন্তে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি চাই, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসূলুল্লাহ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, কে তোমাকে এই কথা বলতে বলেছে? আমি বললাম, কেউ না। আমি নিজেই ভাবলাম দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাহর কাছে আপনার অবস্থান তো বলাই বাহুল্য। তাই ভাবলাম, আপনি যদি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করতেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি দুআ করব। তবে তুমি আমাকে বেশি বেশি সিজদা করার মাধ্যমে সহযোগিতা কর।'।

ইমাম মুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা পালন করে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সিজদা কর। তুমি যতবার সিজদা করবে আল্লাহ তাআলা ততবার তোমার মর্যাদার একটি স্তর বৃদ্ধি করবেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করবেন।

কিয়ামতের দিন নেককাররা মুক্তি পেয়ে যাবে। নামাযের সময় হলে তারা নামায পড়তে চাইবে। তাদের দেহ নামাযের জন্য বেকারার হবে। নামায তাদের হৃদয়ের বসন্ত। আত্মার খোরাক। চোখের মণি ও দেহের স্বাদ। নামায তাদের চিন্তার স্বচ্ছতা, পেরেশানীর সমাপ্তি। বিপদে তারা নামাযমুখী হন। মসীবতে তারা নামাযেই আশ্রয় খুঁজে পান। সুখের দিনে তারা আল্লাহর কাছে পরিচিত হন নামাযের মাধ্যমে। ফলে দুঃখের দিনে আল্লাহ তাআলাও তাদের চিনে নিবেন।

সালফে সালেহীনের নামায

ইমাম যাহাবী রহ. আবু আব্দুল্লাহ সুফিয়ান বিন সাঈদ সাওরীর জীবনীতে উল্লেখ করেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের আবেদ। ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমি সুফিয়ানকে মাগরিবের পর হারাম শরীফে দেখেছি। তিনি নফল নামাযে দাঁড়াতেন। এক সিজদা করতেন। এশার আযানের আগে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন না।

আলী ইবনে ফুযাইল বলেন, আমি কাবায় তওয়াফ করতে এলাম। সুফিয়ানকে দেখলাম, তিনি সিজদারত। আমি তওয়াফের এক চক্র দিলাম। তিনি তখনো সেই সিজদাতেই। আমি দ্বিতীয় চক্র দিলাম তখনো তিনি সিজদায়। এভাবে আমি সাত চক্র, নয় চক্র এমনকি চল্লিশ চক্র দিলেও তাকে সেই সিজদাতেই লুটিয়ে থাকতে দেখলাম।

সুফিয়ান সাওরীর ছাত্র আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমার উস্তাদ সুফিয়ান একদিন আমার ঘরে তাশরীফ আনলে আমি তাঁর জন্য গোশতের ঝুল রান্না করলাম। তিনি তৃপ্তি সহকারে তা খেলেন। তায়েফের বিখ্যাত কিশমিশ পেশ করলাম। তিনি তাও খেলেন। তারপর কলা নিয়ে এলে তিনি তাও খেলেন। খানা শেষ হলে তিনি দাঁড়িয়ে মযবুত করে লুঙ্গি বেঁধে বললেন, 'আব্দুর রাজ্জাক! গাঁধা ঘাস খেয়ে শক্তি অর্জন করেছে। এবার মেহনতের

পালা।' এই বলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত নামায আদায় করলেন।

নেককার বান্দারা যখন মিহরাবে দাঁড়িয়ে যান। দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু তারা ভুলে যান। তারা যখন নামায পড়েন তখন রবের মহব্বত নিয়ে, তাঁর দয়ার স্বীকৃতি নিয়ে, বিনয়ের সাথে এমন ভগ্নমনে দাঁড়ান যা তাদের মহব্বতকে, জান্নাতের তামান্নাকে আরো বাড়িয়ে তুলে। তারা বিপদে আক্রান্ত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বিষয়াদি অনুভব করেন যাতে তাদের মনের পেরেশানী দূর হয়ে যায়। ফলে তারা প্রফুল্লচিত্তে আরো বেশি করে আল্লাহর কাছে সমর্পিত হন।

সুফিয়ান সাওরী ও খলীফা মানসুর

সুফিয়ান সাওরীকে খলীফা আবু জাফর মানসুর বিচারকের পদ অলংকৃত করতে আহ্বান করলে তিনি অস্বীকার করেন। খলীফার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি সম্মত হলেন না। খলীফা রাগান্বিত হয়ে চিৎকার করে বলল, এই গোলাম! তলোয়ার দাও, তলোয়ার! খলীফার আদেশে গোলামরা সুফিয়ানকে মাটিতে ফেলে দিল। নিশ্চিত মৃত্যু অনুভব করে সুফিয়ান বললেন, খলীফা! আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত অবকাশ দিন। কাল আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাব। আশ্বাস পেয়ে খলীফার আদেশে সুফিয়ানকে ছেড়ে দেয়া হল। রাত গভীর হলে তিনি আসবাবপত্র খচ্চরের পিঠে বোঝাই করলেন। তাঁর কোন স্ত্রী-সন্তান ছিল না। ফলে পিছুটান কম ছিল। রাতেই তিনি কুফা ত্যাগ করলেন। পরদিন ভোর থেকেই খলীফা মানসুর তাঁর অপেক্ষায়। কিন্তু দুপুর হয়ে গেল, তখনো সুফিয়ানের খবর নেই দেখে খলীফা তাঁকে খুঁজে আনতে লোক পাঠাল। লোকেরা তাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে জানাল, সুফিয়ান আপনার আদেশ অমান্য করে, আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে গেছে। সংবাদ শুনে খলীফা মানসুর ভীষণ রেগে গেল। যে ব্যক্তি সুফিয়ানকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে তার জন্য বিপুল পুরস্কারের ঘোষণা দিল।

সুফিয়ান কুফা থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? ভাবলেন, ইয়ামেন চলে যাই। ভাবনা মোতাবেক ইয়ামেনের পথ ধরলেন। পথিমধ্যে

পাথের শেষ হয়ে গেলে এক বাগানের মালিকের কাছে শ্রমিক নিয়োজিত হলেন। সেখানে নীরবে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

একদিন বাগানের মালিক তাঁকে ডেকে বলল, হে গোলাম! তুমি কোথেকে এসেছ? বাগানের মালিক জানত না যে তার শ্রমিকই বিখ্যাত আবেদ, ইমামুল মুসলিমীন সুফিয়ান সাওরী। সুফিয়ান জবাব দিলেন, আমি কুফা থেকে এসেছি। মালিক জিজ্ঞেস করল, বলতো! কুফার খেজুর বেশি ভাল নাকি আমাদের এখানকার খেজুর?

সুফিয়ান জবাব দিলেন, আমি এখনো তোমাদের এখানের খেজুর খাইনি। তাই বলতে পারব না কোনটি বেশি ভাল। মালিক বলল, সুবহানাল্লাহ! আমাদের তো এত খেজুর যে ধনী-গরীব এমনকি গাঁধা-কুকুরেও সব সময় আমাদের খেজুর খায়। আর তুমি এখন অবধি খাওনি। অথচ তুমি খেজুর বাগানেই কাজ কর! তা খাওনি কেন? সুফিয়ান জবাব দিলেন, আপনি তো আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি। আর অনুমতি ছাড়া কারো জিনিস খাওয়া তো হারাম। আমি চাই না আমার পেটে কোনো হারাম খাবার প্রবেশ করুক। বাগানের মালিক তাঁর তাকওয়া দেখে অভিভূত হল। আবার ভাবল, হয়ত তিনি বুয়ুর্গ ভাব দেখাচ্ছেন। তাই মন্তব্য করল, বুয়ুর্গ ভাব দেখাও? তুমি তো দেখি সুফিয়ান সাওরী বনে যাবে! তার কথা শুনে সুফিয়ান কিছু না বলে কাজে ফিরে গেলেন। ওদিকে বাগানের মালিক তার এক বন্ধুর কাছে কথা প্রসঙ্গে স্বীয় বাগানের গোলামের কথা বলে বলল, আমার বাগানে এক গোলাম আছে সে এমন এমন বুয়ুর্গ!

তার কথা শুনে বন্ধুর কৌতুহল বেড়ে গেল। বলল, তার কিছু বিবরণ দাও তো। মালিক বিবরণ বললে বন্ধু বলল, আল্লাহর কসম! এই লোকই সুফিয়ান সাওরী। আমার এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই চল! তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে খলীফার পুরস্কার হাতিয়ে নিই। বাগানে ফিরে এসে তারা দেখল, সুফিয়ান ততক্ষণে সে স্থান ত্যাগ করেছেন।

সুফিয়ান তাঁর মাল-সামানা নিয়ে ইয়ামেন পৌছে মানুষের সাথে মিশে গেলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই লোকেরা তাঁকে চুরির মিথ্যা অযুহাতে বিচারের জন্য ইয়ামেনের গভর্নরের কাছে নিয়ে গেল। গভর্নর তাঁকে সামনে বসালেন। লোকেরা তার বিচারের দাবীতে চিৎকার করছিল। গভর্নর চেয়ে দেখলেন এতো এক অভিজাত বৃদ্ধ। তাঁর মাঝে অভিজাত্য ও বুয়ুর্গির

আলামত সুস্পষ্ট। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চুরি করেছ? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! আমি চুরি করিনি। গভর্নর বললেন, লোকেরা তো বলছে তুমি চুরি করেছ? তিনি বললেন, এটা মিথ্যা অভিযোগ। তারা আমার কাছে খুঁজে দেখুক; কোথায় তাদের মাল?

গভর্নর সকলকে দরবার থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করে বললেন, তোমরা যাও। আমি বিষয়টি তদন্ত করছি। সবাই বেরিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সুফিয়ান জবাব দিলেন, আমার নাম আব্দুল্লাহ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমার আসল নাম বল। আমরা সবাই তো আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) সুতরাং এ নাম কোনো পরিচয় হতে পারে না। অন্য নাম বল। তিনি বললেন, সুফিয়ান। আমার নাম সুফিয়ান। জিজ্ঞেস করলেন, কার ছেলে? জবাব দিলেন, আব্দুল্লাহর ছেলে। গভর্নর বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমার পিতার সঠিক নাম বল। তোমার পিতার আসল নাম কী? বললেন, সুফিয়ান ইবনে সাঈদ সাওরী। সুফিয়ান সাওরীর নাম শুনে গভর্নর আসন ছেড়ে মাটিতে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সুফিয়ান সাওরী? বললেন, হ্যাঁ। আমি সুফিয়ান সাওরী। গভর্নর বললেন, আপনিই আমীরুল মুমিনীনের কাজিত ব্যক্তি? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। গভর্নর বললেন, আপনিই তাহলে সেই ব্যক্তি যিনি খলীফা আবু জাফর মানসুরের দরবার থেকে পালিয়েছেন? সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ। গভর্নর বললেন, আপনাকেই তিনি বিচারক হতে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি তাতে সম্মত হননি, তাই নয় কি? বললেন, হ্যাঁ। আপনার জন্যই খলীফা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন? বললেন, হ্যাঁ।

এবার গভর্নর মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ গভীর ভাবনায় ডুবে রইলেন। তারপর বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি যেখানে খুশি অবস্থান করুন। যেখানে খুশি যান। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমার অধীনে আত্মগোপন করেন আমি কিছুতেই আপনার পরিচয় প্রকাশ করব না।

সুফিয়ান গভর্নরের দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। সেখানে অবস্থান তাঁর জন্য সুখকর হল না। ফলে তিনি মক্কায় চলে এলেন। খলীফা মানসুর জানতে পারল সুফিয়ান মক্কায় অবস্থান করছেন। তারও হজ্জের জন্য মক্কায় আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। সে নিজে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে অগ্রগামী

দল হিসেবে কিছু কাঠুরীকে এই আদেশ দিয়ে পাঠাল 'তোমরা সুফিয়ানকে পেলে তাকে গুলিতে চড়াবে।' আমি আসছি।

পাপিষ্ঠ কাঠুরেরা এসে গুলির ব্যবস্থা করল। তারপর হারাম শরীফে প্রবেশ করে 'সুফিয়ান সুফিয়ান' বলে চিৎকার করতে লাগল। সুফিয়ান তখন উলামায়ে কেরামের মধ্যমণি হিসেবে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। তাঁর মাথা তখন বিখ্যাত আবেদ ফুয়ায়েল বিন আয়াযের কোলে। তাঁর পায়ের কাছে বসে আছেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। তারা তাঁকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করুন। আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুকে খুশি করবেন না। আপনি এখান থেকে চলে যান।

সুফিয়ান সেখান থেকে উঠে কাবার কাছে গেলেন। তারপর হাত উঠিয়ে দুআ করলেন 'হে আল্লাহ! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি আবু জাফর (মানসুরের উপনাম) যেন মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে।' তিনবার তিনি এই দুআ করলেন। বাস্তবেই আবু জাফর মক্কার প্রবেশের পূর্বেই পথিমধ্যে মারা গেল। সুফিয়ানকে তার মৃত্যু সংবাদ জানানো হলে তিনি ভাল-মন্দ কোনো মন্তব্য করলেন না।

কাজ্জিত নামায

বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মসজিদে বসে আছেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে নামায পড়তে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামাযের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নামায শেষ করে ঐ ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি যাও। আবার নামায পড়। কারণ তুমি নামায পড়নি। ঐ ব্যক্তি ফিরে গিয়ে আবার আগের মতোই নামায পড়ে রাসূলুল্লাহর কাছে এসে সালাম দিল। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি আবার বললেন, ফিরে যাও। আবার নামায পড়। কারণ তুমি নামায পড়নি। সে ফিরে আবার নামায আদায় করে এসে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ তার সালামের উত্তর দিয়ে এবারো বললেন, ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়। কারণ তুমি নামায পড়নি। এবার ঐ লোক বলল, 'সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন! আমি

এর চেয়ে ভালভাবে নামায পড়তে পারি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যখন নামাযে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবীর দিবে। তারপর যদুর পার কুরআন তিলাওয়াত করবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর সোজা হয়ে বসবে। এভাবে পূর্ণ নামায পড়বে।'

আজব! আজ কত মানুষের নামাযের যে এমন দশা! যাকে নামায শেষে বলা প্রয়োজন, যাও। আবার নামায পড়। কারণ তুমি নামায পড়নি। কাকের ঠোঁকর দেয়ার মতো একেকজন সিজদা করে। অধৈর্য হয়ে রুকু করে। সিজদায় সে তার রবের সাথে গোপন অভিসারে জড়ায় না। দয়াময়, প্রেমময়ের দরবারে তার কোনো বিনয় করে না। অবশ্য আল্লাহ তাআলার অসীম রহমত যে, তিনি আমাদের নামাযের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা রেখেছেন।

সুন্নত ও নফল নামাযের প্রয়োজনীয়তা

মুস্তাদরাকে হাকেমের সহীহ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, 'আমার বান্দার নামাযের দিকে লক্ষ্য কর; তা কী পূর্ণ হয়েছে নাকি তাতে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। পূর্ণ হলে তার জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখা হবে। আর যদি অপূর্ণতা থাকে তাহলে দেখ! তার কোনো নফল আছে কিনা? যদি নফল থাকে তাহলে তা দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দাও। এভাবে অন্য আমলও দেখা হোক।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় সুন্নতে মুআক্কাদার প্রতি অশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। সুন্নতে মুআক্কাদার জন্য মহা পুরস্কারের বাণী শোনাতে।

মুসলিম ও সহীহ ইবনে খুজাইমাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য প্রতিদিন ফরয নামায ছাড়া বার রাকাত নফল নামায আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন। চার রাকাত যোহরের

আগে। দুই রাকাত যোহর, মাগরিব ও এশার পরে। আর দু'রাকাত ফজরের পূর্বে।'

নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা

বান্দার জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আদায় করতেন তাঁর বুক থেকে কান্নার মৃদু গুঞ্জন শোনা যেত। হযরত আবু বকর যখন নামায পড়াতেন; এমন বিনয় করে পড়ত যে, তাঁর কেরাত প্রায় শোনাই যেত না। নামাযে ওমরের ফোঁপানির আওয়াজ পেছনের কাতার থেকেও শোনা যেত।

হযরত আলী বিন হুসাইন রায়ি. যখন নামাযের জন্য অযু করতেন, দেহে কাঁপুনি শুরু হয়ে যেত। ঘেমে নেয়ে উঠতেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'কী আবার! তোমরা কি জান না, অচিরেই কার সামনে আমি দাঁড়াব?!'

হযরত মুসলিম ইবনে যাসার সম্পর্কে তাঁর শিষ্যরা বলেন, আমরা কখনো তাঁকে সামান্য সময়ের জন্যও নামাযে অন্য দিকে মনোযোগী দেখতে পাইনি। একবার মসজিদের ছাদের একাংশ ভেঙ্গে পড়লে পাশে বাজারের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল। কিন্তু ভেতরে মুসলিম ইবনে যাসার নামাযে দাঁড়িয়ে। তাঁর এদিকে কোনো ভ্রক্ষেপ ছিল না। ভয়-আতঙ্ক গ্রাস করবে তো দূরের কথা! তিনি বিষয়টি আঁচও করতে পারেননি।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. বলেন, আমি জামে মসজিদে মুসলিম ইবনে যাসারকে সিজদা থেকে মাথা উঠাতে দেখলাম। তাঁর সিজদার জায়গার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখের পানিতে এতটাই সিক্ত হয়ে আছে মনে হচ্ছিল সেখানে পানি ঢালা হয়েছে।

ইবনে আউদ রহ. বলেন, আমি মুসলিম ইবনে যাসারকে দেখেছি; নামাযে দাঁড়ালে মনে হত যেন একটি কীলক যমীনে এটে দেয়া হয়েছে। পায়ের ভর পাল্টাতেন না। কোনো নড়াচড়াও করতেন না। কারো প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাতও করতেন না।

হযরত কাসীর আলহিমসী রহ. ষাট বছর হিমসবাসীর ইমামতি করেন। কখনো তাঁর নামাযে ভুল হয়নি। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় কখনোই আমার দিলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

নামাযের সময় তারা নিজেদেরকে মহান মালিকের সামনে দাঁড়ানো অতি তুচ্ছ এক মাখলুক ভাবতেন। আসমান যার অনুগত। যমীন যার অনুগত। সবাই যার রহমতের দিকে চেয়ে। প্রতাপশালীরাও যার সামনে চির অবনত।

বান্দার নামাযে আল্লাহর আনন্দ

তারা যখন আল্লাহ আকবার বলেন তাদের দিলে তখন এই অনুভূতি থাকে যে, আমার আল্লাহ সবার চেয়ে মহান। যা কিছু কল্পনায় আসতে পারে সব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর স্থান। সেই মহান সত্তা আমার নামায দেখছেন। আমার মুনাজাত শুনছেন।

বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান গেয়েছে। সে যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে মহিমাম্বিত করেছে। সে যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য। সে যা চাইবে, তাই দেব।

আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর বান্দাকে আমার বান্দা, আমার বান্দা বলে উল্লেখ করেন তখন যে বান্দার হৃদয়ে সামান্য অনুভূতিও রয়েছে তাঁর হৃদয়ে কত আনন্দ, কত যে স্বাদ অনুভব হয়! আরশের অধিপতি, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী রাজাধিরাজ তাকে নিজের বান্দা বলে সম্বোধন করছেন! যিনি দুঃখীজনের সাহায্য করেন। নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দেন। তাঁর সকাশে বান্দার কলব তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন ভাবনায় মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে আসে। তার দেহের নড়াচড়া ধীর হয়ে যায়। তার সব ভাবনা

আল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টি মাগুলার দিদারে স্থির হয়ে যায়। তাঁর সান্নিধ্যের স্বাদ সে অনুভব করতে থাকে। হৃদয়ে অনুতাপের অব্যক্ত স্বাদ সে আশ্বাদন করতে থাকে।

ফলে তার ইবাদত এমন হয় যেন সে আরশে সমাসীন, আসমানের উপরের আল্লাহকে স্বচক্ষে সে দেখতে পাচ্ছে। তখন তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্বলিত আয়াতগুলো সে বলতে থাকে আর সে আদেশ বাস্তবায়ন করতে থাকে। একে একে আল্লাহর বিধানগুলো যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। বান্দার অনুনয় আর আহাজারী তখন আকাশে সেই মহামহিমের দুয়ারে পৌঁছে যায়, যিনি চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যিনি ভালবাসেন। রাগ করেন। সন্তোষ প্রকাশ করেন। শাস্তিও দেন। যা ইচ্ছা করেন। যা চান ফয়সালা দেন। ঘোষিত হয়েছে-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

অর্থাৎ তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজী, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি; আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। [সূরা হজ্জ: ১৮]

নামায : শয়তানকে বিভাড়িত করার অনন্য উপায়

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا تُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِذِينَ، فَإِذَا قَضَى
النَّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تُرِبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ، حَتَّى

يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يَظْلَ الرَّجُلُ لَا يَذْرِي كَمْ صَلَّى.

বান্দার নামাযের কারণে শয়তান যত রাগ হয়, অন্য কোনো কারণে তত রাগ হয় না। তাই সে যখন কোনো আল্লাহর বান্দাকে সিজদারত দেখতে পায় তখন কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে। আর বলতে থাকে, হায় আফসোস! বনী আদমকে সিজদা করতে বলা হয়েছে। আর সে সিজদা করে জান্নাতে প্রবেশ করেছে আর আমাকে সিজদা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু আমি অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে যাব! [সহীহ বুখারি- ৬০৮]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِذَا تُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا تُوبَّ بِهَا أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولَ لَهُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظْلَ الرَّجُلُ إِنْ يَذْرِي كَيْفَ صَلَّى.

যখন নামাযের জন্য আজান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালায়; যেন আজানের ধ্বনি সে শুনতে না পায়। আজান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। আজানের পর আবার নামাযের জন্য ডাকা হলে তখন সে আবার পালায়। ডাকা শেষ হলে সে আবার ফিরে এসে মানুষের মনে বিভিন্ন রকম কল্পনা জাগায়। ভেতর থেকে কুমন্ত্রণা দেয়, এটা মনে কর। ওটা মনে কর। শয়তানের প্ররোচনায় বান্দা তখন সে সব কল্পনা করতে করতে কত রাকাত আদায় করেছে তা ভুলে যায়। [মুসনাদে আহমাদ- ৮১৩৯]

নামাযে থাকাকালীন নামাযকে নষ্ট করার জন্য শয়তান মুসল্লীর ওপর এভাবেই স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শয়তান নামাযীর নামাযকে নষ্ট করার জন্য তার মনকে ঘুরাতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে করতে এক পর্যায়ে যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন নামাযীর পিছনে সে বায়ু ছাড়ে; যেন নামাযীর মনে অযু ভাঙ্গার সন্দেহ জাগাতে পারে। কাজেই তোমাদের কারো মনে এমন সন্দেহ হলে

সে যেন নামায থেকে না ফিরে; যতক্ষণ না সে গন্ধ পায় বা বায়ুর আওয়াজ শুনতে পায়। [তাবরানী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

‘এটা একটা অপহরণ। এর মাধ্যমে শয়তান মুসল্লীকে অপহরণ করে।’

নামায থেকে বাধা দিতে শয়তান এত উদ্যোগী থাকে যে, বান্দা যখন ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথার কাছে তিনটি গিট দেয়। প্রত্যেক গিট দেয়ার সময় সে প্ররোচনা দেয় আর বলে আরে! রাত এখনো অনেক বাকী। আরেকটু ঘুমিয়ে নাও। ফলে সে আর ফজরের নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগতে পারে না। বান্দাকে ঘুমে নিমজ্জিত করে তার নামায কাযা করতে শয়তান এত তৎপর যে, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ** তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে অযু করে তখন সে যেন পানির ছিটা দেয়। কারণ শয়তান নাকের ছিদ্রে রাত যাপন করে। [সহীহ বুখারি- ১১৪২]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, **إِذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ** সে **أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَنَوَظًا فَلْيَسْتَنْتِرْ ثَلَاثًا**, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ সারা রাত ঘুমায়। এমনকি ফজরও কাযা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে এমন ব্যক্তি শয়তান যার কানে পেশাব করেছে। [সহীহ বুখারি- ৩২৯৫]

বেনামাযীর শাস্তি

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যারা যথাসময়ে নামায আদায় করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একবার আমার কাছে দু’জন ফেরেশতা এল। আমি তাদের সাথে চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে আমরা চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির

কাছে এলাম। তার শিয়রের কাছে আরেক ব্যক্তি কুড়াল বা পাথর হাতে দাঁড়ানো যা দ্বারা সে শোয়ে থাকা ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছিল। আঘাতের ফলে পাথর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। দাঁড়ানো ব্যক্তি পাথর কুড়ানোর জন্য গেলে আহত ব্যক্তির মাথা আবার আগের মতো সুস্থ হয়ে যাচ্ছিল। এভাবে আঘাত অব্যাহত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এই ব্যক্তির সাথে এমন নির্মম আচরণ করা হচ্ছে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, এই ব্যক্তি ফরয নামায না পড়ে ঘুমাত।

শয়তান মানুষকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রেখে নামায কাযা করিয়ে দেয়। নামায ছেড়ে দেয়ার এ প্রবণতা ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক পর্যায়ের অপরাধ। কারণ নামায ত্যাগকারী শয়তানের সহচর ও আল্লাহর শত্রু। এমন ব্যক্তি মুমিনদের দুশমন ও কাফিরদের বন্ধু। এদের হাশর হবে ফেরাউন, হামানদের সাথে। ফেরাউন, হামানদের সাথেই বেনামাযীরা জাহান্নামে ঘুরপাক খাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘মানুষ ও কুফরীর মাঝে ব্যবধান হচ্ছে, নামায না পড়া।’ [মুসলিম]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, ‘সাহাবায়ে কেরাম নামায ছাড়া অন্য কিছু ছেড়ে দেয়াকে কুফরী মনে করতেন না।’ [তিরমিযী, হাকেম] ভিন্ন ভাষায় ‘কেবল নামায ছেড়ে দেয়াকেই তারা কুফরী মনে করতেন।’

শায়েখ ইবনে উসাইমিন বলেন, বেনামাযীকে যেহেতু আমরা কাফির মনে করে থাকি। কাজেই এর দাবী হচ্ছে, ধর্মত্যাগী মুরতাদের সকল বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া। সুতরাং তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ চুক্তি হলেও তা বাতিল ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে। বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যদি সে নামায বর্জন করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। তার স্ত্রী তার জন্য বৈধ থাকবে না। সে কোন প্রাণী জবাই করলে তা খাওয়া যাবে না। কারণ বিধর্মীর জবাইকৃত প্রাণী মুসলমানদের জন্য হারাম। সে মস্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। তার কোন মুসলমান আত্মীয় মৃত্যুবরণ করলে সে তার মীরাস পাবে না। বেনামাযী মারা গেলে তাকে গোসল বা কাফন দেওয়া হবে না। তার জানাযাও পড়া যাবে না। মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে কাফিরদের সাথে।

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত বা রহমতের দুআ করতে পারবে না। কারণ সে কাফির।

বেনামাযী ও নামাযী ব্যক্তির মৃত্যু

মৃত্যুর সময় বেনামাযীর অবস্থা করুণ ও ভয়ংকর হয়ে থাকে। ইবনুল কাইয়িম বর্ণনা করেন, এক পাপী ও অবাধ্য ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলে তার আশপাশের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার সামনে আল্লাহর যিকির ও কালেমার তালকীন করতে লাগল। কিন্তু ওই লোকের চোখ থেকে কেবল অশ্রু ঝরছিল। সে কিছু বলতে পারছিল না। রুহ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে সে চিৎকার করে বলল, ‘আমি কালেমা পড়লে কী হবে? কালেমা আমার কোন কাজে আসবে না! কারণ আমি কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়েছি বলে আমার মনে পড়ে না।’ তারপর এক বিকট চিৎকার দিয়ে সে মৃত্যুবরণ করল।

অপরদিকে নামাযী ব্যক্তির মৃত্যু দেখুন! হযরত আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রহ. যখন মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন। তাঁর পাশে বসে পরিবারের লোকজন কান্নাকাটি করছিলেন। তিনি যখন একেবারে মৃত্যুক্ষণে তখন মুআজ্জিন মাগরিবের আজান দিলেন। তাঁর অবস্থা তখন এমন যে আত্মা তখন কণ্ঠনালীতে এসে গেছে। মৃত্যুযন্ত্রণা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। কিন্তু আজানের আওয়াজ কানে পৌঁছতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। আশপাশের লোকদের বললেন, আমাকে ধরে উঠাও! জিজ্ঞাসা করা হল, এই শেষ মুহুর্তে আপনি কোথায় যাবেন? তিনি বললেন, মসজিদে। লোকেরা বলল, এই অবস্থায় মসজিদে! তিনি জবাব দিলেন, সুবহানাল্লাহ! মুআজ্জিনের ডাক শুনব আর তাতে সাড়া দিব না? নিয়ে চল আমাকে। দু’জন তাকে ধরে মসজিদে নিয়ে গেলে তিনি ইমামের সাথে এক রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর সিজাদরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন।

আতা ইবনে সায়েল রহ. বলেন, আমি আবু আব্দুর রহমান সুলামীর কাছে গেলাম। তিনি তখন অসুস্থ হয়ে মসজিদে নামাযের মুসাল্লায় অবস্থান করছিলেন। নামায পড়তে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তখন তাঁর রুহ বের হওয়ার

উপক্রম। আমি শিক্ষাবোধ করলাম। বললাম, আপনি যদি একটু বিছানায় শোয়ে বিশ্রাম নিনেন তাহলে তা সহজ হত।

তিনি জবাব দিলেন, ‘আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় নামাযের বিছানায় থাকাবস্থায় সে নামাযের মাঝে রয়েছে হিসেবেই গণ্য হয়। আমি চাই এ অবস্থাতেই আমার প্রাণ নেয়া হোক।’ অবশেষে তাই হল। নামাযের বিছানাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যারা সবসময় নামায কায়েম করেন, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অটল থাকেন, তাদের শেষ পরিণাম এমন শুভ ও সন্তোষজনকই হয়ে থাকে।

হযরত সাদ ইবনে মুআজ রাযি. অত্যন্ত নেককার, নামাযী ও ইবাদতগুয়ার ছিলেন। তাঁর রাত কাটত ক্রন্দনে আর দিন কাটত নামায ও ইস্তেগফারে। বনু কুরাইজার যুদ্ধে তিনি মারাত্মক আহত হন। কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানানো হলে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা সকলেই চল।

হযরত জাবের রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রওনা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুত চলছিলেন যে, তাঁর সাথে চলতে গিয়ে আমাদের জুতার ফিতা ছিড়ে গেল এবং গায়ের চাদরও খসে পড়ল। তাঁর এত দ্রুত চলায় সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত হলেন। সাহাবিদের বিস্ময় দেখে তিনি বললেন, আমি আশঙ্কা করছি আমাদের আগে সাদের কাছে ফেরেশতারা গিয়ে গোসল দিয়ে ফেলে কি না? যেমন হানযালার বেলায় হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, ততক্ষণে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। সঙ্গীরা তাঁকে গোসল করাচ্ছে। আর তাঁর মা কান্নাকাটি করছেন। মায়ের কান্না দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাদের মা ছাড়া সব ক্রন্দনকারীই মিথ্যা। তারপর সাহাবায়ে কেরাম সাদের লাশ কবরের দিকে নিয়ে চললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে চললেন। খাটিয়া বহনকারীরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাদের লাশের মতো এত হালকা লাশ আমরা আর কখনো

বহন করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, এর কারণ হচ্ছে তাঁর জানাযায় আকাশ থেকে এমন বহু ফেরেশতা নেমে এসেছে, যারা ইতিপূর্বে কখনো দুনিয়ায় আগমন করেনি। তারাও তোমাদের সাথে তাঁর জানাযা বহন করেছে। যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! সাদের রূহকে ফেরেশতারা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এবং তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশও কেঁপে উঠেছে। এমন ব্যক্তিদের শানেই ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.

অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না। [সূরা কাহাফ: ১০৭-১০৮]

জামাতের গুরুত্ব

ফলপ্রসূ নামায তো সেটাই যা আল্লাহ তাআলার হুকমানুসারে আদায় করা হয়। আর আল্লাহর আদেশ হচ্ছে, ফরয নামায মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা।

পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন-

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ.

অর্থাৎ আর তোমরা নামায কয়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। [সূরা বাকারা- ৪৩]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমার ইচ্ছে হয় লাকড়ী জমা করে আগুন জ্বালাতে বলি। তারপর নামাযের আজান দিয়ে কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলে যারা জামাতে উপস্থিত না হয়ে বাড়িতে রয়ে গেছে তাদের বাড়ি গিয়ে তাদেরকে বাড়ির ভিতর রেখেই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।

তিনি আরো বলেন, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! কেউ যদি মোটাতাজা দুশ্বা বা সুন্দর দু'টি প্রাসাদ লাভ করতে চায় সে যেন অবশ্যই এশার জামাতে অংশগ্রহণ করে। অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চোখ তো ক্ষতিগ্রস্ত। বাড়ীও দূরে। আমার কোন রাহবারও নেই যে আমাকে মসজিদে আসতে সহযোগিতা করবে। আমার কি বাড়ীতে নামায আদায়ের অনুমতি আছে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আজান শুনতে পার? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে তুমিও জামাতে উপস্থিত হবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পথে তো অনেক গাছগাছালি! নিয়ে আসারও কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইকামত শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে জামাতে উপস্থিত হবে।' লক্ষ্য করুন! একজন অন্ধ ব্যক্তিকেও জামাত ছাড়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাহলে আমাদের অযাচিত অযুহাতের ভিত্তিতে জামাত ছাড়ার অবকাশ কিভাবে থাকতে পারে?

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, “যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহ তাআলার সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাত করতে পারলে আনন্দিত, সে যেন আজান হলেই নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়াতের পথ অনুমোদিত করেছেন। আর এ নামাযগুলো হচ্ছে তারই অংশ। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায আদায় কর যেমনটি পশ্চাদগামীরা করে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতকে বর্জন করলে। আর নবীর সুন্নতকে বর্জন করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হলে। আমরা নবীযুগে একান্ত পরিচিত মুনাফিক ছাড়া কাউকে জামাতে অনুপস্থিত দেখতাম না।”

সাহাবায়ে কেরামের যুগে দু'জন ব্যক্তির কাঁধে ভর করে করে মানুষকে জামাতে হাজির করে কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। জামাতের ফযীলতের কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বা বাড়ীতে, নিরাপদ অবস্থায় বা শঙ্কায়, সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় কখনোই জামাত ছাড়তেন না।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায়ায়। জরুরে তাঁর দেহ মুবারক পুড়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি বহু কষ্টে ইমামতি করছিলেন। জুমার দিন মাগরিবের নামায জামাতে পড়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। জর প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। বিছানা বিছিয়ে দেয়া হলে তিনি বিছনায় পড়ে গেলেন। এশার নামাযের সময় হলে সাহাবায়ে কেরাম জামাতের জন্য উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তাঁর বিলম্ব দেখে কোনো এক সাহাবি ‘সালাত সালাত’ বলে ডাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ এখনো নামায পড়েননি। সকলেই আপনার অপেক্ষায় আছেন।

জরুর তীব্রতায় তিনি শোয়া থেকে বসতে পারছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি বললেন, বড় মশক থেকে আমার উপর পানি ঢাল। আশপাশের লোকজন তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর দেহ মুবারকে পানি ঢালতে লাগলেন। এতে দেহের উত্তাপ কমল না বটে; তবে তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন। হাতের ইশারায় পানি ঢালা বন্ধ করতে বললেন। তারপর যেই না তিনি হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গেলেন, সাথে সাথে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বেহুশ অবস্থাতেই ছিলেন। তারপর জ্ঞান ফিরলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? জবাব দেয়া হল, জি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছেন।

তিনি বললেন, বড় মশক থেকে আমার উপর পানি ঢাল। কাছের লোকেরা তাঁর দেহ মুবারকে পানি ঢালতে লাগলেন। এতেও দেহের তাপ কমল না। তবে তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন। হাতের ইশারায় পানি ঢালা বন্ধ করতে বললেন। তারপর হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গেলে আবারো বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বেহুশ অবস্থাতেই রইলেন। তারপর জ্ঞান ফিরলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? জবাব দেয়া হল, জি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছেন।

তিনি আবার বললেন, আমার শরীরে বড় পাত্র থেকে পানি ঢাল। দীর্ঘক্ষণ ঠাণ্ডা পানি ঢালার পর তিনি ইশারায় পানি ঢালা থামাতে বললেন। তারপর হাতে ভর করে দাঁড়াতে গেলে আবারো তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ বেহুশ অবস্থাতে থাকার পর হুশ ফিরলে আবাবো জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? জবাব দেয়া হল, জি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা আপনার অপেক্ষা করছেন।

অবশেষে নিজের নিদারুণ দুর্বলতা ও রোগের তীব্রতা লক্ষ্য করে বললেন, আবু বকরকে বল, সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করতে। তারপর আবু বকর কয়েকদিন নামাযের ইমামতি করলেন। সোমবার দিন তিনি কিছুটা সুস্থ ও প্রাণবন্ত অনুভব করলেন। হযরত আব্বাস ও আলী রাযি.কে ডেকে তাদের কাঁধে ডানে বামে ভর দিয়ে মাটিতে পা হিচড়াতে হিচড়াতে মসজিদে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপরও জামাত ছুটেতে দেননি।

আসলাফের জামাতের গুরুত্ব

পরবর্তী যামানার বুয়ুর্গানেদ্বীনের অবস্থাও তাই ছিল। হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযিযের কখনো জামাত ছুটে গেলে তিনি ক্রন্দন করতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের আযাদকৃত গোলাম বারদ বলেন, চল্লিশ বছর সাঈদের জীবন এমন কেটেছে যে, আযানের সময়ই তিনি মসজিদে উপস্থিত। ওয়াকী রহ. বলেন, হযরত সুলাইমান বিন আমাশের সত্তর বছরেও একটি তাকবীরে উলা ছুটেনি। হযরত সুলাইমান মাকদেসীর বয়স যখন প্রায় নব্বই বছর, তখন তাঁকে জামাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, জীবনে কেবল দু'বার ফরয নামায একাকী আদায় করেছি। সবসময় মনে হয় যেন সেই দুই নামায আমি কখনোই আদায় করিনি।

হাতেম আসাম রহ. আফসোস করে বলেন, 'একবার আমার জামাত ছুটে গেলে আবু ইসহাক বুখারী একাই কেবল সান্তনা দিলেন। অথচ যদি আমার সন্তান মারা যেত তাহলে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ আমায় সান্তনা দিতেন।

হযরত রবী ইবনে খাসয়াম রহ. যখন প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন তখনো দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে আসতেন। লোকেরা বলল, হযরত! আল্লাহ তাআলা তো আপনার জন্য সুযোগ রেখেছেন। আপনি বাড়িতে নামায পড়লেই তো ভাল! তিনি জবাব দিলেন, তোমরা

কিভাবে এই কথা বল, অথচ আমি মুআজ্জিনের আজান শুনতে পাই! তোমাদের কেউ যদি মুআজ্জিনের নামাযের আহবান শুনতে পায় তার উচিত হামাণ্ডি দিয়ে হলেও তার ডাকে সাড়া দিয়ে জামাতে উপস্থিত হওয়া।

আল্লাহ তাআলার কাছে এই সব রোগীদের কত সম্মান হবে। আসলে রোগী তারা নন, আমরাই রোগী।

মসজিদে আগে আসার ফযীলত

কোনো বান্দার হৃদয়ে যখন নামাযের মহব্বত থাকবে তখন সে নামাযের জন্য উৎকর্ষিত থাকবে। নামাযের অপেক্ষায় সে প্রহর গুণবে। আজান হতেই দ্রুত মসজিদের দিকে ধাবিত হবে। নামাযের পূর্ব পর্যন্ত দুআ ও যিকিরেই সে মশগুল থাকবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, 'লোকেরা যদি জানত হিজ্রতের মধ্যে কত ফায়দা তাহলে তারা দ্রুত হিজ্রতের প্রতি ধাবিত হত। আর কোনো বান্দা ততক্ষণ নামাযেই থাকে যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে।'

আজ আমাদের একটি ব্যাপক রোগ হয়ে গেছে, নামাযে বিলম্ব করা। বিশেষত জুমার নামাযে। অথচ বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমার দিন যে ব্যক্তি ফরয গোসলের অনুরূপ গোসল করে সকাল সকাল জুমার উদ্দেশ্যে গমন করল, সে যেন একটি উট সদকা করল। তারপর যে গমন করল, যে যেন শিংওয়ালা বকরী সদকা করল। তারপর যে গমন করল, সে যেন একটি মুরগী সদকা করল। তারপর যে গমন করল, যে যেন শিংওয়ালা বকরী সদকা করল। তারপর যে গমন করল, সে যেন একটি ডিম সদকা করল। (ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এ সব কথাগুলো লিখতে থাকেন) এভাবে এক পর্যায়ে ইমাম যখন বেরিয়ে আসেন তখন ফেরেশতারা তার আলোচনা শোনায় মনোযোগী হয়ে যান।

ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জুমার দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এক একজনের

সওয়ার লিখতে থাকেন। তারপর খতীব যখন এসে বসে যান, তখন তারা তাদের সওয়ার লেখার খাতা গুটিয়ে ফেলেন এবং মনোযোগসহ খতীবের আলোচনা শোনেন।

এ জন্যই সালফে সালেহীন জুমায় আগে আসার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতেন। ইমাম যারকাশী রহ. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তী লোকেরা জুমার নামাযে প্রথম যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তা হচ্ছে, দেরী করে জুমায় আসা। অথচ আমরা আমাদের বড়দের দেখতাম তারা বাতি হাতে নিয়ে জুমার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতেন অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগেই চলে আসতেন। তাদের উদ্দেশ্যেই ইরশাদ হয়েছে,

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

অর্থাৎ অতপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহয়াকে আর তার জন্যে স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম; তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। [সূরা আশিয়া- ৯০]

যারা আল্লাহ তাআলার ভালবাসায় জুমার নামাযে সকাল সকাল উপস্থিত হবে কিয়ামতের দিন জান্নাতেও তারা তাঁর সান্নিধ্য পাবে। সেদিন তারা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করবে। ভাল কাজের বিনিময় ভাল ছাড়া আর কি হতে পারে?

অধীনস্ত ও আপনজনদের নামায পড়তে বলুন

একজন ব্যক্তি কেবল নিজে মসজিদে আসাই যথেষ্ট নয়, বরং তার অধীনস্তদের মসজিদমুখী করাও তারই দায়িত্ব। হাদীসের ভাষানুসারে 'এই উম্মতের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' তাহা মাসীক তত ফরহ ইলী ফরহানুসারে

আব্দুল আযিয বিন মারওয়ান তার ছেলে উমরকে ইলম ও আদব শিখতে মদীনায় পাঠালেন। সালেহ বিন কায়সানকে তার দায়িত্ব দিয়ে চিঠি

লিখলেন। সালেহ তাকে নামাযে যত্নবান হতে তাগিদ দিলেন। একদিন সে দেরী করলে সালেহ জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে দেরী হল? সে জবাব দিল, চুল আচড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তোমার চুলের এমন ভালোবাসা যে নামাযের ওপর তাকে তুমি প্রাধান্য দিলে?! তারপর তার পিতার কাছে তিনি চিঠি লিখলেন। পিতা সন্তানের কাছে দূত পাঠালেন। সন্তান মাথা মুগানোর আগে আব্দুল আযিয আর তার সাথে কথা বলেননি।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তার ছেলে হিশামকে একদিন জুমার নামাযে পেলেন না। নামাযের পর লোক পাঠালেন; নামাযে অনুপস্থিতির কারণ জানতে। হিশাম কারণ দর্শালো, আমার খচ্চরটি আমাকে বহন করতে পারছিল না। অন্য কোনো বাহনও পেলাম না। তাই উপস্থিত হতে পারিনি। আব্দুল মালিক তাকে বলে পাঠালেন, সওয়ারী পাওনি বলে কি তুমি জুমায় অনুপস্থিত থাকবে? আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, আগামী এক বছর তুমি কোনো সওয়ারীতে আরোহন করতে পারবে না।

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আমি এক বদরী সাহাবিকে স্বীয় ছেলেকে বলতে শুনেছি, তুমি কি আমাদের সাথে নামায পেয়েছ? ছেলে জবাব দিল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাকবীরে উলা পেয়েছ? ছেলে বলল, জি না। সাহাবি বললেন, আফসোস! তোমার কাছ থেকে কৃষ্ণচক্ষু একশত উটনীর চেয়েও উত্তম জিনিস হারিয়ে গেল!

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. যখন নামাযের জন্য বের হতেন, তখন পরিবারস্থ লোকজনকেও ডেকে ডেকে মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.

অর্থাৎ আর তোমার পরিবাববর্গকে নামাযের আদেশ দাও ও তাতে নিজে অবিচল থাক, আমি তোমার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো মুস্তাকীদের জন্যে। [সূরা ত্বহা: ১৩২]

সুন্নত তরীকায় নামায

ভাইয়েরা! বাস্তবেই মিহরাবের মাঝেই মুমিনের জান্নাত। চোখের পানি ছাড়া গোনাহকে ধুয়ে ফেলার কোনো বিকল্প নেই। আর রুকু-সিজদা দ্বারাই আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফিরাতের দরখাস্ত করতে হবে। যে ব্যক্তি নামাযে রাসূলুল্লাহর সুন্নতের প্রতি যত বেশি যত্নবান হবে তার সওয়াব তত বেশি হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, *صلوا كما رايتموني أصلي* তোমরা নামায পড় সেভাবে যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ। [বুখারী, মুসলিম]

আপনি এমনও দেখবেন যে, দু'জন ব্যক্তি একই মসজিদে একই কাতারে একই সময় একই ইমামের পিছনে নামায পড়ছে। একই সাথে মসজিদে প্রবেশ করেছে। এক সাথেই মসজিদ থেকে বের হয়েছে। অথচ দুই জনের নামাযের সওয়াবের মাঝে আসমান-যমীন পার্থক্য। কারণ কী? কারণ একজন নামায পড়ছে নবীজির সুন্নত অনুসারে। আর অপরজন সুন্নতের প্রতি যত্নবান নয়। এদিকে তার কোনো লক্ষ্য নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সুন্নত মোতাবেক নামায পড়ার তাওফীক দান করুন।

(এরপর এখানে শায়েখ বিন বাযের কিতাব থেকে সুন্নত তরীকায় নামাযের একটি বিবরণ এসেছে। সুন্নত তরীকায় নামায নিয়ে স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বৈচিত্র্য ও ভিন্নমত থাকায় ও আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপট অনুসারে তাতে ভিন্নতার কারণে তা উল্লেখ করা হল না - অনুবাদক)

যাকাতের শরয়ী আহকাম

الحمد لله الذي أنشأ خلقه و برأ و قسم أحوال عباده غنى و فقرا وأنزل الماء و شق أسباب الثرى.

أحمده سبحانه الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصرين سترا وهو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه ديب النمل اذا سرى سبحت له السماوات و أملاكها و سبحت له النجوم وأفلاكها و سبحت له الأنهار و أسماؤها و سبحت له الأرض وسكانها و سبحت له البحار و حياتها تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

أشهد أن محمدا عبده و رسوله وصفيه و خليله و خيرته من خلقه و أمينه على و حيه أرسله رحمة للعالمين و حجة على الناس أجمعين فصلوات الله عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله و سلامه عليه ما تعاقب الليل و النهار و نسأل الله أن يجعل من أمته و أن يحشرنا يوم القيامة في زمرة.

ভাইয়েরা আমার!

যাকাত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ, অর্থাৎ তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু আদায় কর। [সূরা বাকার- ৪৩]

হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে যাকাতকে মুসলমানদের ওপর ফরয করা হয়।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ زَيْتَانٍ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَتَرُكَ، ثُمَّ تَلَا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা যাকে সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে তার সম্পদের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে দু'মুখো বিষাক্ত সর্পে পরিণত করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে, যার চেহারার দু'দিকে দংশন করতে থাকবে আর বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধনভাণ্ডার। তারপর রাসূলুল্লাহ কুরআনে পাকের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

“আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকার প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে যে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।” [সহীহ বুখারি- ১৪০৩; সূরা ইমরান- ১৮০]

যাকাত অনাদায়ের পরিণতি

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُّهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ « قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: " إِطْرَاقُ فَخْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ صَاحِبٍ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ،

يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالِكٌ الَّذِي كُنْتُ تَبْخُلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ".

উটের যে কোনো মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, নিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে এবং উটগুলোও কয়েকগুণ বড় হয়ে আসবে। অতপর তাকে এক সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে। এসব পশু নিজ নিজ পা ও খুর দিয়ে তাকে পদদলিত করতে থাকবে। আর যে সব গরুর মালিক এর হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন ঐ গরুগুলো অনেক মোটা তাজা হয়ে আসবে। তাকে এক সমতল মাঠে ফেলে এগুলো তাকে শিং দিয়ে আঘাত করবে এবং পা দিয়ে মাড়াবে। আর যে সব ছাগলের মালিক এর হক (হক) আদায় করবে না কিয়ামতের দিন এগুলো অনেকগুণ বড় দেহ নিয়ে এসে তাকে এক সমতল ময়দানে ফেলে শিং মারতে থাকবে এবং পা দিয়ে মারতে থাকবে আর এগুলোর কোনো একটিও শিংহীন বা শিং ভঙ্গা হবে না। যে সব ধনাগারের মালিক এর হক আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তার গচ্ছিত সম্পদ একটি টাক মাথার বিষধর অজগর সাপ হয়ে মুখ হা করে তার পিছু ধাওয়া করবে। মালিক পালাবার জন্য দৌড়াতে থাকবে আর পিছন থেকে ঐ সাপ তাকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবে তোমার গচ্ছিত সম্পদ নিয়ে যাও। কারণ এগুলো আমার প্রয়োজন নেই। অতপর যখন সে (মালিক) দেখবে এ সাপ তাকে ছাড়ছে না, তখন সে এর মুখে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিবে। সাপ তার হাত উটের মত চিবাতে থাকবে।" [সহীহ মুসলিম- ৯৮৮]

কখন যাকাত দেয়া ফরয

কোনো ব্যক্তির মাঝে পাঁচটি শর্তের সমন্বয় ঘটলে তার ওপর যাকাত দেয়া ফরয। শর্তগুলো হচ্ছে,

১. স্বাধীন হওয়া। গোলামের ওপর যাকাত ফরয নয়।
২. সম্পদের মালিক মুসলিম হওয়া।

৩. নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। নেসাবের বিবরণ সম্পর্কে সামনে আলোচনা হবে।

৪. সম্পদের মালিকানা স্থির থাকতে হবে। সম্পদ যদি অন্য কারো কাছে আটকা থাকবে কিংবা সম্পদে ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বাধা থাকে, তাহলে ওই সম্পদের যাকাত ফরয নয়।

৫. সম্পদের ওপর ব্যক্তির মালিকানা এক বছর গত হতে হবে। তবে শস্য বা ফলের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য নয়।

প্রাণীর যাকাতের বিধান

দুই শর্ত সাপেক্ষে উট, গরু ও বকরীর যাকাত দেয়া ওয়াজিব। তা হচ্ছে,

১. যদি এ সকল প্রাণীর দ্বারা তার দুধ বা প্রজননের মাধ্যমে লাভবান হওয়া।

২. পূর্ণ বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় তা যদি মাঠে-ময়দানে চরে নিজের খাবার সংগ্রহ করে। পক্ষান্তরে যদি পূর্ণ বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় তাকে কেনা খাবার খাওয়াতে হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

স্বর্ণ-রূপার যাকাতের বিধান

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ .

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিতে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দক্ষ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আশ্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার। [সূরা তাওবা- ৩৪]

সহীহ মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ.

যে স্বর্ণ বা রূপার যাকাত আদায় করা হয় না, কিয়ামতের দিন তার মালিককে আগুনের বর্ম পরানো হবে। [সহীহ মুসলিম- ৯৮৭]

স্বর্ণের পরিমাণ যদি ৮৪ গ্রাম বা তার বেশি হয় আর রূপার পরিমাণ যদি ৫৯৫ গ্রাম বা তার বেশি হয়, তাহলে তার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

শরীয়ত পুরুষের জন্য রূপার আংটিকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে। স্বর্ণকে পুরুষের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছে। আর মহিলাদের জন্য স্বর্ণ বা রূপার যে কোনো ধরনের অলংকারকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, أَحِلُّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ, স্বর্ণ ও রেশমী পোষাককে আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তবে পুরুষদের জন্য এগুলোকে হারাম করা হয়েছে। [মুসনাদে আহমাদ- ১৯৫০৩]

তবে মহিলাদের ব্যবহারের বা ধারকৃত অলংকারের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'অলংকারের ওপর কোনো যাকাত নেই।' অনেক সাহাবায়ে কেলাম এ মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের মাঝে হযরত আনাস, জাবের, ইবনে ওমর,

হযরত আয়েশা, আসমা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, পাঁচজন সাহাবি এমর্মে ফতোয়া দিয়েছেন। কারণ এ পর্যায়ের অলংকার বর্ধনশীল নয়। কাজেই তা পরিধেয় পোষাক ও বসবাসের গৃহের অনুরূপ। তবে অলংকার যদি এমন হয় যা কখনোই ব্যবহার করা হয় না, বরং প্রয়োজনের সময় তা বিক্রির নিয়তে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে। কারণ তখন তা গচ্ছিত সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হবে। (মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ এবং বর্ণিত মতামতটি অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ীদের মতের সাথে সাংঘর্ষিক)- অনুবাদক।

ফায়েদা : স্বর্ণ বা রূপাকে পাত্র, কলম, বাহন, চাবিসহ এ জাতীয় কোনো ব্যবহারিক পণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রূপার পাত্রে পানি পান করে সে মূলত তার কণ্ঠনালীতে জাহান্নামের আগুন ধারণ করে।'

নেসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপার মূল্য পরিমাণ যদি কারো কাছে অর্থকড়ি থাকে তাহলে বছরান্তে তারও যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সম্পদের নেসাবের পরিমাণ রূপা দ্বারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, পাঁচ ওকিয়ার কম সম্পদে যাকাত নেই।' আর পাঁচ ওকিয়া ৫৯৫ গ্রাম। কাজেই কেউ যদি এর বেশি সম্পদের অধিকারী হয় এবং তাতে বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে তার শতকরা ২.৫% হারে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সম্পদ যেহেতু স্থিতিশীল নয়, বরং প্রতিনিয়ত বাড়ে-কমে। তাই বছরের একটি নির্ধারিত দিনকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করে সেই তারিখ অনুসারে যাকাত দেয়া বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে সেই তারিখে যাকাতযোগ্য যে সম্পদগুলো ব্যক্তির মালিকানায় থাকবে, চাই সব সম্পদে পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হোক বা না হোক, সমুদয় সম্পদের যাকাত দেয়া ওয়াজিব হবে।

কোনো ব্যক্তির মালিকানায় যদি নেসাব পরিমাণ নগদ অর্থ থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। সেই সম্পদ যে উদ্দেশ্যেই সঞ্চিত করা হোক। ভরণ-পোষণ, মেয়ের বিবাহ, জমি ক্রয়, ঋণ পরিশোধ বা যে কোনো উদ্দেশ্যেই তা সঞ্চয় করা হোক, তার যাকাত দিতে হবে। কারণ যে সকল আয়াত বা হাদীসের মাধ্যমে যাকাতের হুকুম প্রমাণিত হয়েছে, তাতে নগদ অর্থের মালিকানা থাকাকালীন উদ্দেশ্যগত কারণে

হুকুমগত বিভাজনের কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের সমাজে কিছু যাকাত আদায়ের জন্য কেবল রমযানকেই ধার্য করে। যদিও যাকাতের হুকুম রমযান কেন্দ্রিক কোনো হুকুম নয়। বছরের যে কোনো সময়েই তা আদায় করা যায়। তবে হিসাবের সুবিধার্থে এরূপ করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

ব্যবসায়িক পণ্য বলতে যে পণ্যকে বেচাকেনা করে মুনাফা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তা উদ্দেশ্য। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বেচাকেনার জন্য নির্ধারিত পণ্যের যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিতেন।' কাজেই কোনো পণ্যে ব্যবসার নিয়ত করা হলে এবং তাতে বছর অতিক্রান্ত হলে সেই পণ্যের যাকাত দিতে হবে। বছর অতিক্রান্তের শর্তের কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ** 'বছর অতিক্রান্ত না হলে কোনো সম্পদের যাকাত নেই।' [সুনানে আবু দাউদ- ১৫৭৩]

এ জাতীয় বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, বছরান্তে সমুদয় পণ্যের তালিকা করবে, তারপর এর বর্তমান বাজার মূল্য হিসাব করে সেই মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত আদায় করবে। যেমন কারো দোকান বা কারখানায় যদি বিভিন্ন ধরনের পণ্য থাকে এবং তাতে বছর অতিক্রান্ত হয় তাহলে সেই সব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করবে। মূল্য যদি এক লাখ টাকা হয় তাহলে তার ২.৫% হারে যাকাত আদায় করবে।

নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর বছরের মাঝে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে বছর অতিক্রান্ত না হলেও তার যাকাত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূল নেসাবের ওপর বছর অতিক্রান্ত হওয়াই যথেষ্ট। আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেক সম্পদের ওপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী নয়। যেমন এক ব্যক্তি দোকান খুলে এক লাখ টাকার মাল তুলল। সারা বছর কেনা-বেচা হল। বছর শেষে যদি তার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাহলে তাকে সমুদয় পণ্যের যাকাত দিতে হবে। যদিও সব পণ্য তার মালিকানায় পূর্ণ বছর ছিল না। এখানে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, যাকাত আদায়ের

ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয় মূল্য হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে। ক্রয় মূল্য হিসেবে নয়।

ব্যবসায়িক পণ্য ছাড়া অন্যান্য পণ্য যেমন বাসা-বাড়ির ফার্নিচার, টিভি-ফ্রিজ, ফ্যাক্টরীর মালবাহী গাড়ি, মেশিনারীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কাজেই একজন ব্যবসায়ী কেবল তার ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত দিবে। ব্যবসার সহযোগী পণ্যের যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে হুবহু ওই পণ্যের ২.৫% দেয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই, বরং পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে অর্থ আদায় করাই যথেষ্ট। শরীয়তের উদ্দেশ্যই তাই। কারণ এতেই সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিহিত। তবে যদি পণ্য এমন হয় যে, দরিদ্র ব্যক্তিদের যে পণ্যের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে তা দ্বারাও যাকাত আদায় করা যেতে পারে।

জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি, বা যানবাহনের ওপর কোনো যাকাত নেই। তবে এগুলোকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হলে যাকাত আদায় করতে হবে। তবে ভোগ বা ব্যবহারের জন্য হলে যাকাত আদায় করতে হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘কোনো মুসলমানের ওপর তার গোলাম বা ঘোড়ার জন্য কোনো নেই।’ তবে জমি, বাড়ি বা গাড়ি যদি বিক্রির জন্য হয়। অর্থাৎ ব্যবসা করার নিয়ত করা হয়, তাহলে বছরান্তে এগুলোর বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে যখন এগুলোকে বিক্রির সংকল্প করা হয় তখন থেকে বছরের হিসাব বিবেচনা করা হবে। এ পর্যায়ের নিয়ত না হলে তার যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়। কাজেই যে বিক্রি একটি জমি ক্রয় করল, কিন্তু বিক্রি করার নিয়ত এখন চূড়ান্ত হয়নি, বরং সিদ্ধান্তহীনতায় রয়েছে, তাহলে এই জমির যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়।

কোনো ব্যক্তির ওপর যদি যাকাত ওয়াজিব হয় আর তিনি তা আদায় করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার ওয়ারিসদের কর্তব্য মৃতের সম্পত্তি থেকে সেই যাকাত আদায় করে দেয়া। মৃত্যুর কারণে জীবিত অবস্থায় ওয়াজিব হওয়া যাকাতের দায় থেকে মুক্তি মিলবে না।

যে সমস্ত বিন্দিং, দোকান-পাট বা ভূমি ভাড়া দেয়া হয়, তার মূল্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং তাতে বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

অদ্রুপ ব্যক্তিগত গাড়ি বা রেন্ট এ কারের গাড়ির ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যেহেতু এগুলোকে বিক্রির জন্য ক্রয় করা হয়নি।

আসলাফের দানের নমুনা

তারিখে বাগদাদে খতীবে বাগদাদী প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের বদান্যতার একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। একবার তাঁর কাছে এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে তার ঋণ পরিশোধ করতে অনুরোধ করল। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি তার ম্যানেজার বরাবর একটি চিরকুট লিখে দিয়ে ওই ব্যক্তির হাতে দিয়ে তাকে ম্যানেজারের কাছে পাঠালেন। সেই ব্যক্তি চিরকুট নিয়ে ম্যানেজারের হাতে দিলে তিনি তা দেখে বললেন, আপনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে আপনার কত টাকা ঋণ পরিশোধ করতে অনুরোধ করেছেন? সে জবাব দিল, সাতশত দিরহাম। এ কথা শুনে ম্যানেজার তার মালিকের কাছে লিখে পাঠাল, ‘আপনার পাঠানো ব্যক্তি আপনাকে সাতশত দিরহাম দেয়ার অনুরোধ করেছে আর আপনি তাকে সাত হাজার দিরহাম দেয়ার কথা লিখে পাঠিয়েছেন। এভাবে দিতে থাকলে তো কোষাগার একেবারে শূন্য হয়ে যাবে।’ তার জবাবে আব্দুল্লাহ লিখে পাঠালেন, আরে! মাল যেমন শেষ হয়ে যাবে আমিও তো শেষ হয়ে যাব! কাজেই তাকদীরের ফয়সালা হিসেবে আমার কলমে যা লিখা হয়ে গেছে তাই তাকে দিয়ে দাও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জীবনীতে রয়েছে, তিনি প্রায়ই সিরিয়ার রাক্কায় সফরে যাওয়া-আসা করতেন। সেখানে গেলে এক যুবক তাঁর সোহবতে আসত। তাঁর খেদমত করত এবং তাঁর থেকে হাদীস শুনত। একবার তিনি রাক্কা গেলে সেই যুবককে আর পেলেন না। তার সম্পর্কে খোঁজ নিলে লোকেরা জানাল, সে ঋণ পরিশোধে বিলম্বের দরুণ জেলখানায় বন্দী। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তার ঋণের পরিমাণ কত? বলা হল, দশ হাজার দিরহাম।

তারপর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক গোপনে খোঁজ নিতে নিতে ওই যুবকের পাওনাদারের সন্ধান পেলেন। রাতে তাকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তাকে দশ হাজার দিরহাম দিলেন এবং এই তার থেকে এ মর্মে কসম আদায়

করলেন যে সে এ ঋণ পরিশোধের কথা তাঁর জীবদ্দশায় কারো কাছে বলবে না। এরপর তাকে বললেন, এবার তো তোমার পাওনা পরিশোধ হল, এখন যুবকের নামে তোমার মামলা প্রত্যাহার করে যুবককে মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। পাওনাদারকে বিদায় জানিয়ে সেই রাতেই তিনি রাক্ষা ত্যাগ করেন।

ওদিকে যুবক জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার জানল যে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাক্ষায় এসেছিলেন এবং তার খোঁজ করেছিলেন। এ কথা জানার পর তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যুবকও রাক্ষা থেকে দামেস্কের পথে রওনা হল। পথিমধ্যে দুই-তিন স্টেশন পর এক স্টেশনে সে আব্দুল্লাহকে পেয়ে গেল। তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আরে! তুমি কোথায় ছিলে? তোমাকে তো এবার দেখলাম না! যুবক উত্তর দিল, ঋণ দরুণ বন্দী ছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, তা কি করে এত জলদি মুক্তি পেয়ে গেলে? জবাব দিল, এক অজ্ঞাত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। তার পরিচয় জানা নেই। আব্দুল্লাহ দুআ করলেন, আল্লাহ তাআলার জন্যই সকল প্রশংসা যিনি তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন।' এরপর আরো কিছু কথাবার্তা বলে যুবককে বিদায় জানালেন। যুবককে ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে দেননি যে, তিনিই সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি যে রাতের আধারে তার ঋণ পরিশোধ করেছে। আসলাফের দানের এমন বহু নজীর রয়েছে। তারা যাকাত বা অন্যান্য দানকে ফলাও করা তো দূরের কথা খোদ গ্রহিতাকে জানতে দিতেন না যে কে তাকে অর্থ দান করে দিল। বর্তমানে যাকাতদাতাদের জন্য তাদের আদর্শ অনুসরণীয়।

সদকায়ে ফিতরের আলোচনা

ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে সাধারণত ঈদের দিনের দু-তিন আগে যে সদকা করা হয়ে থাকে একে যাকাতুল ফিতর বা সদকায়ে ফিতর বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ঈদের নামাযের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল, তার রবের নাম স্মরণ করল ও তারপর নামায আদায় করল সেই সফলকাম হল। [সূরা আ'লা: ১৪-১৫]

আর হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকায়ে ফিতরকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক স্বাধীন- গোলাম, পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড় সকল (সামর্থবান) মুসলমানের ওপর এক সা গম বা যব সদকায়ে ফিতর হিসেবে দেয়াকে ফরয করেছেন।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে, এক সা, যা ২.৪০ কিলোগ্রামের সমতুল্য। (সায়ের পরিমাণের ক্ষেত্রে ৩ কেজি ২৬০ গ্রামের মতটি বেশি অগ্রগণ্য- অনুবাদক) কোনো দেশে সে দেশীয় প্রচলিত প্রধান খাদ্য পণ্য যেমন চাউল, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদির মাধ্যমেও তা আদায় করা যাবে। (নির্ভরযোগ্য মতানুসারে হাদীসে বর্ণিত কোনো একটি বস্তুর মাধ্যমে সদকার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে- অনুবাদক)

সদকায়ে ফিতর আদায়ের উত্তম সময় হচ্ছে ঈদের রাতে সূর্য ডোবার পর অর্থাৎ রমযানের শেষ তারিখের সূর্যাস্তের পর তা আদায় করা। তবে তার আগে আদায় করারও সুযোগ আছে। তবে ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে তা আদায় করাই সর্বোত্তম। ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত তা বিলম্ব করা জায়েয নেই।

একজন মুসলিমকে তার নিজের ও তার অধীনস্থ স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা যদি তার অধীনে থাকেন তাহলে তাদেরও সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। কারণ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের পক্ষ থেকেও সদকায়ে ফিতর আদায় কর।'

এমনকি গর্ভে সন্তান থাকলে তারও সদকা আদায় করা উত্তম। হযরত উসমান রাযি. এ মর্মে আমল করেছিলেন। যাদের সদকা আদায় করা জরুরী নয়, তাদের সদকা আদায় করাও জায়েয। যেমন কেউ চাইলে তার বাসার কাজের বুয়া বা ড্রাইভারের পক্ষ থেকেও সদকা আদায় করতে পারেন।

সদকায়ে ফিতর হিসেবে খাদ্য জাতীয় বস্তু দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সুন্নত। খাদ্যের পরিবর্তে মূল্য দেওয়া যদিও জায়েয তবে তা সুন্নত পরিপন্থি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো সাহাবি এমন করেছেন বলে প্রমাণ

পাওয়া যায় না। (সদকার উদ্দেশ্যের সাথে অধিক সংগতি থাকায় যাকাতের মতো সদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রেও মূল্য আদায়ে কোনো সমস্যা নেই। কারণ অর্থ লাভ করা দরিদ্র ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণে অধিক সহায়ক- অনুবাদক)

যাকাতযোগ্য সম্পদ

ব্যক্তি মালিকানাধীন যে কোনো সম্পদেই যাকাত ওয়াজিব হয়। এমনকি এতিম শিশু বা পাগলের মালিকানাধীন সম্পদেরও যাকাত দেয়া ওয়াজিব। তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক বা দায়িত্বশীল তা আদায় করবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন এবং তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য শান্তিদায়ক আর আল্লাহ তাআলা সব কিছু দেখেন ও জানেন। [সূরা তওবা: ১০৩]

পক্ষান্তরে যে সম্পদের কোনো মালিক নেই যেমন মসজিদ নির্মাণের জন্য সংগৃহীত সম্পদ বা কোনো কল্যাণ ফাণ্ডের সম্পদ এগুলো নেসাব পরিমাণ হয়ে তার ওপর বছর অতিক্রান্ত হলেও তার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়।

যাকাত আদায়কালে দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের কথা বলে দেয়া জরুরী নয়। তবে কোনো ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কি না এ মর্মে সন্দেহ থাকলে তাহলে সে ক্ষেত্রে দাতার দায় মুক্তির জন্য যাকাতের বিষয়টি স্পষ্ট করা কর্তব্য। যেন গ্রহীতা উপযুক্ত না হলে সে তা ফেরত দিতে পারে কিংবা উপযুক্ত কাউকে তা দিয়ে দিতে পারে। যাকাতের বিষয়টি না জানলে হাদিয়া মনে করে সে ব্যবহার করে ফেলতে পারে।

প্রত্যেক দেশের যাকাত সে দেশে আদায় করাই উত্তম। সে দেশের দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেই যাকাত বন্টন করে দেয়া উত্তম। তবে শরয়ী কোনো

কল্যাণকর দিক থাকলে অন্য দেশেও তা আদায় করতে বাধা নেই। যেমন কারো দরিদ্র আত্মীয়-সজন বহিরাষ্ট্রে থাকলে তাদের যাকাত পাঠাতে কোনো অসুবিধা নেই।

যাকাত বর্ষ পূর্তির পূর্বেই যাকাত আদায় করা জায়েয। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রাযি. থেকে বর্ষপূর্তির পূর্বেই যাকাত গ্রহণ করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবু দাউদ) কাজেই কারো কাছে যদি সফর মাসে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি আসে, অথচ তার যাকাতবর্ষ শেষ হয় রমযানে তাহলে তার জন্য যাকাতের নিয়তে এখনি চলতি বা আগামী বর্ষের যাকাত আদায় করা জায়েয। সে ক্ষেত্রে রমযানে যাকাতের হিসাবকালে ঐ অর্থটুকু বাদদিয়ে অবশিষ্ট যাকাত প্রদান করবে।

যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কারা?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যাকাত হচ্ছে ফকীর, নিঃস্ব, যাকাত উসুলকারী ও যাদের মনতুষ্ট করা প্রয়োজন জন্য এবং দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তের জন্য, মুজাহিদ ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফরয বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা- ৬০]

এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিরাই যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। এই কয়েক শ্রেণী ছাড়া অন্য কাউকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যাকাতের ক্ষেত্রে কোনো নবী বা অন্য কারো ফয়সালায় সম্বন্ধ নন। তিনিই তার জন্য আটটি খাত উল্লেখ করে দিয়েছেন।’

(১-২) ফকীর-মিসকীন যারা তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার সামর্থ রাখে না। কাজেই এমন ব্যক্তিদেরকে তাদের পরিবারের এক বছরের ভরণ-পোষনের জন্য প্রয়োজনীয় যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে। তবে এমন

ব্যক্তিদের ব্যাপারে অর্থের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরূপ আশঙ্কা থাকলে। যেমন যদি এমন আশঙ্কা থাকে বেশি অর্থ পেলে সে এক বছরের প্রয়োজনীয় অর্থ এক মাসেই খরচ করে ফেলবে, তাহলে নির্ভরযোগ্য কাউকে এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে যে ব্যক্তি তাকে প্রত্যেক মাসে কিস্তিতে অর্থ প্রদান করবে।

ধনী বা অর্থ উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ধনী বা সবল ব্যক্তিদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। (নাসায়ী, আহমাদ)

(৩) যাকাত সংগ্রাহক যারা যাকাত সংগ্রহের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাদের জন্য যাকাতের অর্থ থেকে তাদের পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। তবে তাদের জন্য সরকারীভাবে বেতন নির্ধারণ থাকলে যাকাতের অর্থ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করা তাদের জন্য জায়েয হবে না। যেমন বর্তমানে এদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বেতন নির্ধারিত। যাকাত উত্তোলনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যই তাদের বেতন দেয়া হয়। কাজেই আলাদাভাবে যাকাতের অর্থ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তাদের জন্য হারাম।

(৪) যাদের মন ভুষ্ট করার শরয়ী প্রয়োজন রয়েছে। এমন লোকেরা দুই শ্রেণীর। ১. কাফের ২. মুসলমান। কাফেরদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে কিংবা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে হিফাজত করতে কাফেরদেরকে যাকাত দেয়ার সুযোগ আছে। আর নও মুসলিমদেরকে ঈমানের ওপর অটল রাখতেও যাকাত দেয়া যাবে।

(৫) দাস মুক্তকরণ। বর্তমানে এ শ্রেণীর দাসের অস্তিত্ব প্রায় নেই। যখন দাসপ্রথার প্রচলন ছিল তখনকার সময়ে কোনো দাসকে মুক্ত করার স্বার্থে যাকাতের অর্থ প্রদান করার অনুমতি ছিল।

(৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। যারা ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণগ্রহণ করে তা আদায় করতে না পেরে আকস্মিকভাবে বিপদে পড়ে গেছেন, অথচ তিনি ঋণ আদায় করতে চাচ্ছেন, তাদেরকে ঋণ আদায়ের জন্য যাকাত দেয়া যাবে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যারা ঋণ গ্রহণ করেন, কিংবা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা রাখেন না, তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না।

(৭) আল্লাহর পথের পথিক। অর্থাৎ মুজাহিদ যারা আল্লাহর পথে জিহাদে রত তারা যদি বাড়ি থেকে দূরে থাকার কারণে প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ সংকটে থাকে তাহলে তাদেরকেও যাকাত দিয়ে সহযোগিতা করা যাবে।

(৮) মুসাফির ব্যক্তি যার মালিকানায় সম্পত্তি রয়েছে, কিন্তু বাড়ি থেকে দূরে থাকার কারণে তিনি সেই সম্পত্তি থেকে উপকৃত হতে সক্ষম নন, অর্থ সংগ্রহ বা ঋণ নিয়ে তা ফেরত পাঠানোর মতো বিকল্প কোনো মাধ্যমও যার কাছে নেই, এমন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে। তবে যে ব্যক্তি সফরের পরিকল্পনা করেছে সে এ শ্রেণীয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

রোযার পয়গাম

الحمد لله الحمد لله المحمود بجميع الحامد تعظيما وثناء المتصف بصفات الكمال عزة
وكبرياء.

سبحانه ما أعظم شأنه. وما أقدم سلطانه.. وما أوسع حلمه غفرانه أحمده سبحانه. فهو
المستحق للحمد الثناء. يحكم ما يريد و يفعل ما يشاء خلق فقدر. وملك فدير و شرع
فيسر جعل قوة الأمة في إيمانها وعزها في اسلامها والتمكين لها في صدق عبادتها.
أحمده سبحانه وأشكره.. وأتوب إليه و أستغفره.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفضل
الرسول وخاتم الأنبياء. وخير المتعبدين ورأس الأولياء. أفضل من صلى وصام. ووفق
بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. صلى الله وسلم وبارك عليه. ما ذكره الذاكرون
الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك عليه. ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا
من خيار أمته. وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة.

প্রিয় রোযাদার ভাই ও বোনেরা!

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ দয়া যে, তিনি আমাদেরকে বরকতময়
এমন একটি মৌসুম দান করেছেন যাতে আমরা সামান্য কষ্টে প্রভূত কল্যাণ
লাভ করতে পারি, বিপুল সওয়াব অর্জন করতে পারি। এটা মহা কল্যাণের
মাস। বরকত ও মঙ্গলের মাস। আলো ও আনন্দের মাস। এটা সেই মাস
যে মাসে বান্দার গোনাহের মূলোৎপাটন করা হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়,
তার ডাকে রহমানের পক্ষ থেকে সাড়া দেয়া হয়। এ মাসে পাপীর পাপ
ক্ষমা করা হয়। পূণ্যবানের প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

রমযানের আগমনে রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের আনন্দ
রমযান এমন একটি মাস যার আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী হতেন এবং তিনি স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামকে এ
মাসের শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করতেন।

বিশুদ্ধ সূত্রে সুনানে নাসায়ী ও সুনানে বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট বরকতময় মাস রমযান মাস আগত। এ মাসের রোযাকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর ফরয করেছেন। জান্নাতের দুয়ারসমূহ এ মাসে খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দুয়ারসমূহ এ মাসে বন্ধ করে দেয়া হয় আর দুষ্ট জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এ মাসের এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল সে প্রকৃত অর্থেই বঞ্চিত হল।’

হ্যাঁ, ভাইয়েরা! কোনো ব্যক্তির জন্য রমযান মাস লাভ করা আল্লাহ তাআলার মহান একটি নেয়ামত লাভ করা।

কত কাছের মানুষ মৃত্যুর ফলে এ মাস আসার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কত অন্তরঙ্গ বন্ধু বন্ধুদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কত রোগার্ত মানুষের ভীড়ে হাসপাতালগুলো ভরে গেছে। রমযানের রোযার রাখার আকাজ্জা যাদের হৃদয়কে ভেঙ্গে খানখান করে দিচ্ছে। কত মানুষ আফসোস করে, হায়! রমযানের একটি রোযা যদি রাখতে পারতাম! একটি রাতের জন্য হলেও যদি রমযানের রাতের তারাঘীতে শরীক হতে পারতাম! কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাদের ইচ্ছা ও কামনার মাঝে অন্তরায় হয়ে গেছে। বাধা ও অন্তরায় দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর, সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এ ব্যাকুলতা ও হতাশার কোনো মূল্য নেই। তাই সময় থাকতেই সময়ের সদ্ব্যবহার করা জরুরী। সে জন্যই আল্লাহ তাআলার নেককার বান্দাগণ অধীর আগ্রহে রমযানের প্রতীক্ষায় থাকেন। রমযানের কামনায় তারা বিভোর থাকেন, যেন রমযানের একটি মুহূর্ত সময় অবহেলা বা অপচয়ে ব্যয় না হয়।

হযরত মুআল্লা ইবনে ফযল রহ. বলেন, সালফে সালেহীন রমযান প্রাপ্তির তাওফিক নসীব হয় সে জন্য ছয়মাস আগে থেকেই আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ শুরু করতেন।

হযরত ইয়াহয়া ইবনে কাসীর রহ. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম এভাবে দুআ করতেন, اللهم سلمني الى رمضان و سلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে রমযান পর্যন্ত সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।

রমযানেও আমাকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখুন। আর আমাকে রমযান মাসে কবুল করুন।)

তাদের কাছে রমযানের আগমন এমন সময় ঘটত যখন তারাও এর প্রতীক্ষাতেই রয়েছেন। এমন নয় যে, রমযান এসে গেল আর তারা গাফলতের চাদরে মুড়ি দিয়ে তখনো নিদ্রায় বিভোর। নামায, নফল রোযা, দান-সদকা ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদির মাধ্যমে তারা রমযান আসার আগে থেকেই রমযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করতেন। কাজেই আমার ভাই ও বোনেরা রমযান আসছে। রমযানের রাতের বেলা জাগ্রত থাকুন। দিনের বেলায় তৃষ্ণার্ত থাকুন। কয়েকটি মাত্র দিন। একে সুযোগ ও গণীমত মনে করুন।

আপনি যদি সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে একটু খোঁজ নেন তাহলে দেখতে পাবেন, তারা কিভাবে রমযান অতিবাহিত করতেন। রমযানের রাতের বেলা তাদের চোখে থাকত অশ্রু। ভারী নিঃশ্বাস আর কোমল মনে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কিংবা সিজদায় অশ্রুসজল প্রার্থনারত; এই ছিল তাদের রমযানের চিত্র।

তারা এমন এক জামাত ছিলেন যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার এই ইরশাদ সত্য প্রমাণিত হয়েছিল,

تَتَحَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থাৎ তাদের পার্শ্বদেশ শয়নগাহ থেকে দূরে থাকে। তারা ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার কাজের বিনিময় স্বরূপ চক্ষু শীতলদায়ক কী যে গোপন রাখা হয়েছে। [সূরা সিজদা: ১৬-১৭]

রমযান কী আমাদের কাছেও সাক্ষাত ও মিলনের প্রত্যাশা ও দাবী করে না? কেন করবে না? নিশ্চয়ই করে। রমযান আমাদের কাছ থেকেও এমন আশ্রয় ও উদ্দীপনা প্রত্যাশা করে। আমরাও যেন তার অপেক্ষায় প্রহর গুণি, তাকে নিয়ে স্বপ্ন আঁকি, সকলের কাছ থেকেই রমযান সেই প্রত্যাশা করে।

রমযান সেই মাস যে মাসে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ**, অর্থাৎ রমযান সেই মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা মানুষের জন্য হিদায়াত, হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন এবং হক-বাতিলের পার্থক্যকারী। [সূরা বাকারা: ১৮৫]

হাদীসের ভাষ্যানুসারে রমযান সেই মাস যে মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে যায়। এ মাসে হযরত জিবরাইল আ. প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমন করতেন। এ মাসে পাপীর পাপ মোচন করা হয়। এ মাস দুই রমযানের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত যাবতীয় কবীরা গোনাহকে মোচন করে দেয়। এ মাসে জান্নাতের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। জাহান্নামের দুয়ারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়।

এ মাসে যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে, সওয়াবের আশায় রোযা রাখবে তার পূর্ব কৃত সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ মাসে ওমরা পালন করাকে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জ পালনের সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন। এ মাসে এমন এক রজনী রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। এটা তওবা ও সন্তুষ্টির মাস। ঈমান ও সফলতার মাস। এ মাসে কত মানুষের মুক্তি মেলে! কত হাতের প্রাপ্তি মেলে! কত গোনাহগারের গোনাহের ক্ষমা অর্জিত হয়! এ মাসে মালিকের পক্ষ থেকে বান্দার আমলের বিনিময় দেয়া হয়!

রোযাদার ভাইবোনেরা! রোযা হচ্ছে ভাগ্যবানদের ইবাদত। সমস্ত ইবাদতের সর্দার। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সেরা উপহার।

রোযার ফযীলত

রোযা হচ্ছে একমাত্র ইবাদত যা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের সাথে বিশেষিত করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের সকল আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন ‘কেবল রোযা ছাড়া। কারণ রোযা কেবল আমার জন্যই রাখা হয়। কাজেই আমি স্বয়ং তার প্রতিদান দেব। বান্দা তার কামনা, পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে।’

রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন ‘রোযাদারের জন্য রয়েছে দু’টি আনন্দ। একটি আনন্দ তার রোযার সমাপ্তিতে। আরেকটি আনন্দ তার রবের সাথে সাক্ষাতলগ্নে। রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তাআলার কাছে মেশকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণপূর্ণ।’

রোযা হচ্ছে ধৈর্যশীলদের ইবাদত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের অগণিত বিনিময় প্রদান করা হবে। [সূরা যুমার : ১০]

রোযা হচ্ছে গোনাহের কাফফারা। সহীহ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আমিত্ব, সন্তান ও প্রতিবেশী সর্বত্রই রয়েছে ফিতনা। রোযা, নামায, দান-সদকা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এসব ফিতনাকে নির্মূল করে দেয়।’

রোযাদারের ফযীলতের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রোযাদারের জন্যে দরুদ পাঠ করেন। তার প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণও রোযাদারের মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে থাকেন।

সহীহ ইবনে হিব্বান ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ সেহরী গ্রহণকারী তথা রোযাদারগণের প্রতি দরুদ পাঠ করে থাকেন।’

রোযা হচ্ছে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। সুনানে নাসায়ীতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে তার থেকে একশত বছরের দূরত্বে সরিয়ে দিবেন।'

জামে তিরমিযীতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মাঝে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পরিমাণ গভীর পরিখা নির্মাণ করে দিবেন। কিয়ামতের দিন রোযাদারগণ 'বাবে রাইয়ান' দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বাবে রাইয়ান জান্নাতের সেই দুয়ার যা দিয়ে কেবল রোযাদারগণই প্রবেশ করবে। সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তা দিয়ে প্রবেশের পর এই দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি এই দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে সে এক প্রকার পানীয় পান করবে। আর যে তা পান করবে সে আর কখনোই তৃষ্ণার্ত হবে না।'

রোযা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম একটি সোপান। মুসনাদে আহমাদে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'একদিন রোযা রাখার মাধ্যমেও যার মৃত্যু হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

সালফে সালেহীনের নিকট রোযার অবস্থান

সালফে সালেহীন রোযার প্রতি সব সময় যত্নবান থাকতেন। কেবল রমযানের রোযাই নয়, সারা বছরই তারা রোযার অনুশীলন করতেন। কারণ রোযার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন। তাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে থাকেন।

সুনানে নাসায়ী ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা রাযি.এর মাঝে কোনো বিষয়ে মনোমালিণ্যতা ঘটেছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক তালাক প্রদান করেন। ইত্যবসরেই হযরত জিবরাইল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নিকট আগমন করে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে হাফসার তালাক

প্রত্যাহার করতে আদেশ করেছেন। কারণ তিনি অধিক পরিমাণে রোযা রাখেন এবং দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। আর জান্নাতেও তিনি আপনার স্ত্রী হবেন।' অহী নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাক প্রত্যাহার করে তাঁকে ফিরিয়ে নেন।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। আবু উমামা তাঁর কাছে গেলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার শাহাদাতের জন্য দুআ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে নিরাপদ রাখুন এবং গনীমতের সম্পদ দান করুন।' আবু উমামা বলেন, ফলে যুদ্ধে আমরা নিরাপদ রইলাম এবং গনীমতের সম্পদও লাভ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে আমি আবার তাঁর কাছে গেলাম। আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার শাহাদাতের জন্য দুআ করুন। তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে নিরাপদ রাখুন এবং গনীমতের সম্পদ দান করুন।' আবু উমামা বলেন, ফলে ঐ যুদ্ধেও আমরা নিরাপদ রইলাম এবং গনীমতের সম্পদও লাভ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে আমি এবারও তাঁর কাছে গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর আগে আমি আরো দু'বার আপনার কাছে এসেছি। আপনার কাছে আমার শাহাদাতের জন্য দুআ কামনা করেছি, অথচ আপনি দুআ করেছেন 'হে আল্লাহ! তাদেরকে নিরাপদ রাখুন এবং গনীমতের সম্পদ দান করুন।' ফলে যুদ্ধে প্রতিবারই আমি নিরাপদ রইলাম এবং গনীমতের সম্পদও লাভ করলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বিশেষ কোনো আমল করার আদেশ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি রোযা রাখতে থাক। কারণ রোযার কোনো বিকল্প নেই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই অসিয়ত ও আদেশ আবু উমামা এমনভাবে রপ্ত করলেন যে, এরপর আর কখনো তিনি, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর খাদেমকে কখনো রোযা ছাড়া দেখা যায়নি। কেউ কখনো তাঁর বাড়িতে আর দিনের বেলা চুলার ধুয়া দেখতে পায়নি। হঠাৎ কখনো দিনের বেলা ধুয়া দেখা গেলে সবাই বুঝত, হয়ত তাঁর বাড়িতে কোনো মেহমানের

আগমন ঘটেছে। নয়ত দিনের বেলা এ বাড়িতে খাবার আয়োজনের কোনো সম্ভবনা নেই।

আবু উমামা বলেন, কিছুদিন পর আমি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গমন করলাম। আরয করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করেছেন। আশা করি এতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বরকত দান করবেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আরেকটি কাজের আদেশ করুন।’ তিনি ইরশাদ করলেন, ‘জেনে রাখ! তুমি যখনই আল্লাহকে সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তাআলা তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটি গোনাহ হ্রাস করবেন।’ এরপর আবু উমামা নামায ও রোযাকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলেন।

এমনি ছিল বাস্তবতা। সালফে সালেহীন মহজ্জ কাজের হক ও দাবী বুঝতেন ও হৃদয়ঙ্গম করতেন। নফল রোযার জন্যই তারা এত উৎসাহী ও লালায়িত ছিলেন। সে হিসেবে রমযানের ফরয রোযার বিষয় তো বলাই বাহুল্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা ফরমান ‘আমি বান্দার ওপর যা ফরয করেছি তার বাইরে আমার বান্দা আমার কাছে যা নফল হিসেবে স্বেচ্ছায় পাঠায় তা আমার কাছে অধিক প্রিয়।’

রোযার রাখায় সালফে সালেহীনের মুজাহাদা

ইমামে সালেহ ইবরাহীম বিন হানি রহ. প্রচুর রোযা রাখতেন। এমনকি তিনি যখন বার্ধ্যাক্যে উপনীত হলেন, মরণব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তখনো রোযা ছাড়েননি। আসরের পর মৃত্যুর সময় ঘণিয়ে এল। মৃত্যুর সব আলামত পরিদৃষ্ট হতে লাগল। মুখ থেকে গোসানীর মত শব্দ বেরুচ্ছিল। মুখের থুথু, জিহ্বা শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বীয় সন্তানের দিকে তাকালেন। বললেন, বৎস! আমি তৃষ্ণার্ত। সন্তান পানি নিয়ে এল। পানির পাত্র মুখের কাছে ধরা হলে, তিনি তৎক্ষণাত ঠোটজোড়া বন্ধ করে ফেললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি অস্তমিত হয়েছে? সন্তান জবাব দিল, জ্বি না। তিনি পানির পাত্রকে মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন। সন্তান পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু তিনি অনড় রইলেন। রোযা ভাঙতে অস্বীকৃতি জানালেন। অগত্যা

সন্তান বাধ্য হয়ে বসে পড়ল। পানির পাত্র হাতে নিয়ে মাগরিবের আযানের অপেক্ষা করতে লাগল।

এ সময় শায়খের গোঙ্গানী সামান্য বন্ধ হল। এরপরই তিনি তিলাওয়াত করলেন, فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ هَذَا لِمِثْلِ هَذَا অর্থাৎ এমন জিনিসের জন্য আমলকারীরা যেন আমল করে। [সূরা সাফফাত : ৬১] তারপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে করতে তিনি স্বীয় রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

রোযার প্রতি এই যে হৃদয়ের টান ও আত্মহ এ কেবল পুরুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যুগে যুগে নারীগণও এ কষ্ট ও মোজাহাদায় পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। পবিত্র ঘরের নেককার রমণীগণের এমন বহু উপমা রয়েছে।

এমনি একজন মহীয়সী রমণী হচ্ছেন, হযরত নাফীসা বিনতে হাসান, যিনি অত্যাধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। এমনকি তিনি যখন বার্ধ্যক্যে উপনীত হলেন, শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেল, দেহের হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেল, মৃত্যুর কাঙ্ক্ষিত সময় ঘনিয়ে এল তখনো তিনি রোযা ছাড়েননি। মরণব্যাপি যখন তাঁকে শেষবারের মতো আক্রান্ত করল সেই অন্তিম দিনগুলোতেও তিনি ছিলেন রোযাদার। মৃত্যুবল্লণা চরম আকার ধারণ করলে সন্তানরা তাঁকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে অনুরোধ করলে তিনি তাদের দিকে চাইলেন। তখন তাঁর ঠোটজোড়া সংকুচিত হয়ে আসছিল। যবান ভারী হয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাদের বললেন, কী আশ্চর্য! আমি গত ত্রিশ বছর অবধি রোযা রেখে যাচ্ছি কেবল এই কামনায় যে, আমি আমার রবের সাথে রোযাদার অবস্থায় সাক্ষাত করব। আজ যখন তাঁর সাথে মিলনের সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন কি তোমাদের অনুরোধে আমি রোযা ভেঙ্গে ফেলব?!

এরপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন-

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ.

অর্থাৎ বলুন! আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তা কার? বলুন, আল্লাহর। তিনি অনুগ্রহ করাকে নিজের ওপর স্থির করে নিয়েছেন। [সূরা আনআম : ১২] তাঁর পবিত্র আত্মা তাঁর প্রিয়তমের নিকট পৌঁছে গেল।

কত ভাগ্যবান এই সকল নেককার নারী-পুরুষ। তারা তাদের রবকে ভালোবেসেছেন। তিনিও তাদের ভালোবেসেছেন। তারা তাদের রবের সান্নিধ্য কামনা করেছেন। তিনিও তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন।

ইমাম ইবনে আবী আদি বলেন, হযরত দাউদ ইবনে আবু হিন্দ রহ. চল্লিশ বছর এমনভাবে কাটিয়েছেন যে, একদিন রোযা রাখতেন, পরের দিন রোযা ছাড়তেন। এভাবে এত দীর্ঘকাল তিনি কাটিয়েছেন, অথচ তা অন্যরা তো নয়ই; তাঁর পরিবারস্থ লোকেরা পর্যন্ত টের পায়নি। তাদেরকে না জানার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা জবাব দিল, তিনি ছিলেন পেশায় মুচি। প্রতিদিন ভোরে বাড়ি থেকে বের হয়ে দোকানে যেতেন। খাবার সাথে করে নিয়ে বের হতেন। যেদিন রোযা রাখতেন না সেদিন খাবার খেতেন। আর যেদিন রোযা রাখতেন সেদিন রাস্তায় গরীব-মিসকীনদের মাঝে খাবার বিলিয়ে দিতেন। এরপর সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরতেন। বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকদের সাথে খানা খেয়ে রোযা ভাঙতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.ও প্রচুর রোযা রাখতেন। মৃত্যু যখন তাঁর দুয়ারে উপনীত হল তখন তিনি বললেন, আখেরাতে কেবল দুনিয়ার তিনটি বিষয় না থাকতেই আমার আফসোস হবে। অন্য কোনো কিছু না থাকায় আমার আফসোস হবে না। বিষয় তিনটি হচ্ছে, ১. প্রচণ্ড গরমের দিন তৃষ্ণিত হওয়ার অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমের কারণে পিপাসা যখন প্রবল আকার ধারণ করে এমন দিনে রোযা না রাখতে পারার কারণে আফসোস হবে। ২. দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র ইবাদতে কাটানোর কষ্টভোগ হাতছাড়া হওয়ার দরুণ আফসোস হবে। ৩. আমার যামানার বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী তথা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে পারার দরুণ আফসোস হবে।

রোযার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য

পূর্বেকার বুয়ুর্গানেদ্বীন নিয়মিত রোযার অনুশীলন করতেন এবং একে জান্নাতে যাওয়ার সোপান হিসেবে গণ্য করতেন। রোযার হুকুমের মাঝে নিহিত 'হিকমতে এলাহী'কে তারা হৃদয়ঙ্গম করতেন।

আফসোস! আজ বহু মানুষ রোযা রাখে, কিন্তু তাদের মাঝে কম মানুষই এমন যারা জানে যে, কেন সে রোযা রাখছে! অথচ এটাই ইবাদত ও

সাধারণ অভ্যাস-স্বভাবের মাঝে পার্থক্য। সাধারণ অভ্যাসের কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ইবাদত কখনো উদ্দেশ্যহীন হয় না। কেন আমরা রোযা রাখব? রমযানে কেন আমরা পানাহার থেকে বিরত থাকব? ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকব কী কারণে? রাত জাগব, ক্লান্ত হব কোন মনসে?

কত প্রকার খাদ্য হাতের নাগালে! ঠাণ্ডা পানি চোখের সামনে। তারপরও আমরা হাত বাড়াই না কেন? কেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন? আমাদেরকে অভুক্ত ও পিপাসিত রাখার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মাকসাদ কী?

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং এ সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হল যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। [সূরা বাকার- ১৮৩]

এ আয়াতে রোযাকে ফরয করার মাকসাদ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'রোযাকে তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে।' কেন ফরয করা হয়েছে তোমরা কি তা জান? রোযাকে কি এ জন্য ফরয করা হয়েছে যেন তোমরা অভুক্ত বা তৃষ্ণার্ত থাক? কিংবা তোমরা ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়? নতুবা এর কারণ কী? আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার জবাব দিচ্ছেন, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

তাকওয়া অর্জন করাই রোযার কাক্ষিত উদ্দেশ্য। তাকওয়া হচ্ছে, চলমান ভয় ও শঙ্কা। মূলত রোযা তো মুখের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। পেট, হাত বা পায়ে কোনো ভূমিকা রাখে না। রোযার প্রভাব পড়ে কলবের ওপর।

সূতরাং আপনি যখন রোযা রাখলেন আপনার পেটে তার প্রভাব পড়ল। তা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। মুখে তার প্রভাব পড়ল। মুখ শুকিয়ে গেল। আপনার দেহে তার প্রভাব প্রতিফলিত হল। দেহ দুর্বল হয়ে পড়ল, কিন্তু আপনার কলব তথা অন্তরাত্মায় কোনো প্রভাব পড়ল না। আপনার কলব আল্লাহর

ভয়ে ভীত হল না। কলব নরম হল না। নফসে আন্মারা পরাজিত হল না, তাহলে আপনার উপবাস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রোযার কাজিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। রোযার মূল মাকসাদই হচ্ছে তাকওয়া। তাই রমযানে আমাদেরকে তাকওয়া হাসিল করতে হবে। কবি বলেন,

خل الذنوب صغيرها * وكبيرها ذلك التقى

واصنع كماش فوق أرض * الشوك يحذر ما يرى

لا يحقرن صغيرة * ان الجبال من الحصى

অর্থ : ছোট বড় সব গোনাহ ছাড়। এটাই তাকওয়া। যমীনের উপর এমন ভাবে পথ চল, কাঁটায়ুক্ত পথে পথিক যেমন সতর্কভাবে নীচের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে পথ চলে। কোনো ছোটকে তুচ্ছজ্ঞান কর না। কারণ পাহাড় তো নুড়ি পাথরেই সৃষ্ট।

তাকওয়ার মর্ম কী? তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আমল করা। অল্পে তুষ্ট থাকা। পরকালের সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

যে ব্যক্তি নিজের জীবনে তাকওয়ার অনুশীলন করবে সে অনুভব করবে যে, তার গোটা জীবন কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। ফলে সে তাই করে যা তিনি চান। সে সময়মত নামায আদায় করে। রোযার সময় রোযা আদায় করে। যাকাত ফরয হলে যাকাত প্রদান করে। যথাসাধ্য কুরআন তিলাওয়াত করে। মোটকথা আল্লাহ তাআলার যখন যে হুকুম তা পালন করে।

আজ রোযাদারদের খোঁজ নিয়ে দেখুন! তারা মনে করে, রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা। রোযার মাধ্যমে তারা হালাল বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত রাখে ঠিকই; কিন্তু ওদিকে হারামের মাধ্যমে রোযাকে তারা ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলে।

যে রোযাদার ইফতারের সময় হলে বলে, এবার তৃষ্ণা দূর হয়েছে। শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে। আর পারিশ্রমিকও চূড়ান্ত হয়েছে। এরপর সে তার সিগারেটে আগুন ধরায়; এমন রোযা রোযাদারের জীবনে কী ভূমিকা রাখতে পারে!

সেই ব্যক্তির রোযার কী স্বার্থকতা যে ব্যক্তি কেবল ইফতারের রকমারী খাবারের কারণে আনন্দিত হয়? এমন রোযা ইবাদত নয়, বরং পানাহার বর্জন করে নিছক উপবাস থাকার নামান্তর।

সেই ব্যক্তি থেকে কিসের তাকওয়া আশা করা যায় যে, তার উদরকে খাবার থেকে বিরত রেখেছে; অথচ তার চোখকে অবৈধ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারেনি! তার কানকে অবৈধ কিছু শোনা থেকে বাঁচাতে পারেনি! তার যবানকে গোনাহের কথা থেকে বিরত রাখতে পারেনি!

সেই ব্যক্তির রোযা কিভাবে তাকওয়া বাস্তবায়ন করবে যে ব্যক্তি দিনে বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করে, কিন্তু রাত্রি বেলা নফসের গোলাম হয়ে কাটায়? তার রাত কাটে সম্পদের প্রাচুর্যে বা ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থেকে অথবা কে জানে হয়ত তার রাত কাটে রাতের কোনো হাস্যরসের নাট্য বিনোদনে কিংবা কোনো হেঁচৈ জম্পেশ আড্ডায়। কবি বলেন,

ان لم يكن في السمع مني تصاون * وفي بصري غرض وفي منطقي صمت.

فحظي اذا من صومي الجوع والظمأ * فان قلت اني صمت يومي فما صمت.

অর্থ : যদি শুনতে কোনো বাধা না থাকে, চোখে কোনো পর্দা না থাকে, মুখে নীরবতা না থাকে তাহলে আমার রোযার নিয়তি কেবলই উপবাস। সে ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, আমি আজ রোযা রেখেছি। তাহলে তা সঠিক নয়। কারণ সেদিন প্রকৃতার্থে আমি কোনো রোযা রাখিনি।

কাজেই আপনি যদি রোযার মাধ্যমে তাকওয়ার প্রতিফলন কামনা করেন তাহলে আপনার কলব ও শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখুন। হৃদয়কে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখুন। চোখকে যাবতীয় অবৈধ দৃষ্টি থেকে বিরত রাখুন। কানকে অশ্লীল কথা ও গানবাদ্য শোনা থেকে বিরত রাখুন। যবানকে অশ্লীল ও নোংরা কথা বলা থেকে বিরত রাখুন। হাতকে আল্লাহর কোনো বান্দাকে কষ্ট দেয়া ও ফিতনাপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখুন। পাকে হারাম কাজে পথচলা থেকে বিরত রাখুন, যেন সে কোনো গোনাহের দিকে বা পাপের পথে অগ্রসর হতে না পারে।

রোযা আপনাকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহস যোগাবে। আপনার বীরত্ব ও সংকল্পে দৃঢ়তা আনয়ন করবে। কামনার অবাধ্য জিনে নিয়ন্ত্রণের লাগাম পরাবে। আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণে গতি সঞ্চার করবে। আল্লাহর দরবারে আমিত্ব বিসর্জনে আপনাকে শক্তি যোগাবে। রোযা আপনার মাঝে ইসলামের ওপর অটল থাকতে এমন ইম্পাত কঠিন মনোবল ও প্রস্তুতসম সংকল্প তৈরি করবে যার সামনে নফসে আশ্মারার থবল ঢেউগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে।

রোযার মাধ্যমে এ শক্তি অর্জনের পর আপনি আপনার কলবকে এমন একটি পরিকল্পনায় সংকল্পবদ্ধ করুন যা আপনাকে সঠিক পথ ও সুনিশ্চিত গন্তব্যের দিশারী করবে। রমযানের আগমন যেন আপনার মাঝে নব জীবনের সূচনা আনতে সক্ষম হয়।

রমযান আপনার মাঝে সংকল্পের দৃঢ়তা আনয়ন করবে

রমযান আপনার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করবে। রমযানে আপনি স্বেচ্ছায় খানা পরিহার করেছেন। পাণীয় থেকে বিরত রয়েছেন। কেউ আপনাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখেনি। আপনার মাথার ওপর কোনো পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি। তারপরও আপনি এগুলো থেকে বিরত থাকছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আপনার মাঝে এক ধরনের মানসিক ও আত্মিক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এ শক্তিকে আপনি কাজে লাগান। এখন আপনি রমযানে বারংবার কুরআন খতমের সংকল্প করুন এবং সংকল্পকে বাস্তবায়ন করুন। পূর্ণ রমযান মাস তারাবীর জামাতে শরীক হওয়ার সংকল্প করুন এবং সংকল্পকে বাস্তবায়ন করুন। ধূমপান বর্জনের সংকল্প করুন এবং তা বাস্তবায়ন করুন। চোখ ও কানকে হারাম থেকে পবিত্র রাখার সংকল্প করুন এবং পবিত্র থাকুন।

রমযানের পরিবেশগত সুযোগকে গ্রহণ করুন

রমযান সত্যান্বেষীদের জন্য নিজের মাঝে পরিবর্তন আনার এক সুবর্ণ সুযোগ। নিজেকে সংশোধনের জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত আর কোনো সময়

হতে পারে না। রমযান আমাদেরকে বুঝতে শেখায় যে, আমাদের মাঝেও শক্তি রয়েছে, যে শক্তির সামনে কঠিন থেকে কঠিনতর কোনো বস্তু টিকে থাকতে পারবে না।

অধিকাংশ মানুষের মাঝেই ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও লক্ষ্য থাকে যা সে বাস্তবায়ন করতে চায়, কিন্তু পারে না। অথচ শাবান ও রমযানে মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন! কিভাবে সমাজের চিত্র পাল্টে যায়! মসজিদগুলো মুসল্লিতে ভরপুর হয়ে যায়। দানশীলদের হাতে দানের দরিয়া বয়ে যায়। তিলাওয়াতকারী ও রোযাদারেরা, ইবাদতকারী ও নামাযীরা এ সময় কী চমৎকার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে! শয়তান থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার এটাই কী সবচেয়ে মোক্ষম সময় নয়?

এই সকল ব্যক্তিগণ যদি সত্যান্বেষী হয় তাহলে কী তারা নিজের মাঝে পরিবর্তন আনতে কিংবা নিজের সংশোধন করতে পারেন না?! কত তরুণ-যুবকরা বুঝে, তাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তন প্রয়োজন। কত কাল আর হারাম সম্পর্কে সে জড়িয়ে থাকবে? কত কাল আর ঘুমের ঘোরে নামায থেকে বিরত থাকবে?

কার কাছে নিজের সমস্যার কথা আপনি তুলে ধরবেন? বন্ধু-বান্ধব, প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা কামনার পূজারীদের কাছে? আর কত কাল আপনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে দৌড়াবেন? কেন আপনি আপনার চলার গতিকে থামাচ্ছেন না? আপনার মনে কেন ভাবনার উদয় হয় না যে, কেন আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আপনার রব আপনার কাছে কী চান? কেন তিনি আপনাকে এই দুনিয়ায় অস্তিত্ব দিলেন? এ সব ভাবনা কি আপনাকে তাড়িত করে না? আপনার বিবেককে এ সব নাড়া দেয় না?

ইহুদী জাতি ও কল্যাণের সুযোগকে হেলায় নষ্ট করার ইতিহাস

আপনি যদি এমন কাপুরুষদের জীবন্ত উপমা দেখতে চান, তাহলে ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য করুন! যারা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বুঝা সত্ত্বেও পরিবর্তন আনার জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে পারেনি। তারা ক্রমান্বয়ে নিজেদেরকে এমন জীবনধারায় অভ্যস্ত করে ফেলেছে, যা থেকে তাদের

বেরিয়ে আসা ছিল কষ্টসাধ্য। ফলে পরবর্তীতে বহু সুযোগ পাওয়ার পরও তারা নিজেদের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এরপর এলেন হযরত ঈসা আ.। তিনিও তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ'র দুনিয়ায় আগমনের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও কখনোই তাঁর সত্যায় সন্দিহান ছিল না। তারা খুব ভাল করে জানত যে, তিনিই সেই শেষনবী যার আনুগত্য করতে হযরত মুসা আ.ও আদিষ্ট ছিলেন। তারা জানত, তাদের উভয় জগতের মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম গ্রহণ করা। তারা এটাও জানত যে, তারা তাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও কেবল অহংকার ও হিংসাবশত তারা জেনেশুনে সত্যকে গোপন করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে যে জীবনধারায় তারা নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে ফেলেছে যা থেকে বেরিয়ে আসা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সময় যতই অতিক্রম হচ্ছে, দিনের পর দিন যতই গত হচ্ছে, বছর যতই পার হচ্ছে, তারা সত্যকে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে, অথচ তাদের ইসলামের আনুগত্যের অনিহা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আহযাব যুদ্ধের সময় ইহুদীদের অবস্থানের দিকে ফিরে তাকান! কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র ও তাদের সাহায্যকারীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধের সংকল্প করল। তারা তাদের বাহিনীকে প্রস্তুত করে মদীনার দিকে অগ্রসর হল।

হঠাৎ সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রাভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন! কী করবেন; ভেবে পেরেশান হলেন। তারা গভীর ভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। ভেবে দেখলেন যে, মদীনার তিনদিক পাহাড় ও বন পরিবেষ্টিত। কাজেই কাফেরবাহিনী ঐসব দিক দিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না। কেবল খোলা দিকটি দিয়েই তাদের আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে যে দিকটি নিম্ন ও সমতল ভূমি। অতএব তারা কাফেরদের মদীনা প্রবেশে বাধা দিতে মদীনার ওই দিকের প্রবেশ পথে পরিখা খনন করলেন।

কাফের সৈন্যদল সেখানে পৌঁছে এমন অদ্ভুত বাধার সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। কারণ পরিখায় বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনার বিষয়টি তাদের কল্পনাতেও আসেনি। এখন তারা কিভাবে তা অতিক্রম করবে আর কিভাবেই বা মুসলমানদের পরাজিত করবে; সেই দুশ্চিন্তায় তাদের কপালে ভাজ পড়ল। অগত্যা পরিখার ওপারেই তারা শিবির স্থাপন করল।

সে সময় মদীনায় কিছু ইহুদী গোত্রের বসবাস ছিল। তারা তাদের সুদৃঢ় কেল্লায় বাস করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে এ মর্মে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন যে, মুসলিম বা ইহুদীরা কেউ অপরের সাথে যুদ্ধে জড়াবে না এবং কোনো পক্ষ অপর পক্ষের মোকাবেলায় শত্রুকে সাহায্য করবে না।

কিছু ইহুদীদের অভ্যাসই হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা করা। যখন তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় আরবের বিভিন্ন গোত্রের সংঘবদ্ধতা এবং মুসলমানদের বিপদ আঁচ করল তখন তারা ভাবল, এবারই ইসলামের চূড়ান্ত পরাজয় পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই ভেবে তারা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করল। কাফেরদের কাছে মুসলমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধের সাহায্য পাঠাল। কেবল এতেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি, বরং তারা মুসলমানদেরকে পরিখা পাহারায় ব্যতিব্যস্ত ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দেখে সুযোগ বুঝে হঠাৎ উন্মুক্ত তরবারী হাতে মদীনার রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ক্রমে তারা মুসলমানদের বাড়ি-ঘরের প্রতি অগ্রসর হতে লাগল এবং সেখানে অবস্থানরত মুসলিম নারী ও শিশুদের উপর আক্রমণ করতে উদ্ধত হল। এমনকি তারা হাসসান বিন সাবেতের কেল্লার কাছে উপনীত হল যেখানে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও আরো কিছু মুসলিম নারী ও শিশু অবস্থান করছিলেন। তারা সেখানে আক্রমণোদ্যত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের চক্রান্তকে নস্যাৎ না করলে তারা নারীদের সম্ভ্রমহানি ও কিছু মানুষ হত্যার দাঁড়প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলমানরা প্রায়ই এমন যুদ্ধের মুখোমুখি হতেন। আর যখনই মুসলমানরা এমন কোনো বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন তখনই ইহুদীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাফেরদের সহযোগিতা করত। ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস নতুন নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের প্রতি তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সব সময় চলমান ছিল এবং আজো অব্যাহত আছে।

আহযাব যুদ্ধ ছিল মুমিনদের জন্য একটি অগ্নি পরীক্ষা। চতুর্থমুখী সমস্যায় তারা ছিলেন জর্জরিত। শত্রুপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় কম, হাতিয়ারে দুর্বল; তদুপরি ভেতর-বাইরের শত্রু, সব মিলিয়ে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি! মুমিনগণ দিব্য চোখে সুস্পষ্ট পরজায় দেখতে পাচ্ছিলেন। তাদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করলেন। তাঁর বাহিনীকে তিনি বিজয়ের সম্মান দান করলেন। আর কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করলেন। কুরাইশরা মক্কার পথে পালিয়ে গেলে ইহুদীদের মাথার উপর যেন আসমান ভেঙ্গে পড়ল। তারা নিজেদেরকে কেল্লায় গুটিয়ে নিল। কঠিন সময়ে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ ইহুদীরা বাস্তবেই সেদিন কঠিন শাস্তির উপযুক্ত ছিল।

আহযাবের যুদ্ধ শেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার ইহুদীদের একটি উচিত শিক্ষা দেয়ার সংকল্প করলেন। তাদের কেল্লার চতুর্পাশে তিনি সৈন্যশিবির স্থাপন করলেন। তাদেরকে কেল্লায় অবরুদ্ধ করে আত্মসমর্পণের আহবান জানালেন, কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে তিনি তাদের একদিন, দু'দিন, তিনদিন এভাবে এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ করে করে পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলেন। এ দীর্ঘ সময় তারা নিজেদের অবস্থানে অনড় রইলেও এক পর্যায়ে অবরোধ তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠল। আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারাও বুঝে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শায়েস্তা না করে এবার বাড়ি ফিরবেন না।

তারা কেল্লার অভ্যন্তরে সকলে এক জায়গায় সমবেত হল। এই সমাবেশে ইহুদীদের সর্দার কাব বিন আসাদ ইহুদীদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আবেগঘণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দিল। সে বলল, হে ইহুদীরা! তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তোমাদের ওপর কী চরম মসীবত আপতিত! এ সংকটময় পরিস্থিতিতে আমি তোমাদেরকে তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমরা এর যে কোনোটি গ্রহণ করতে পার কি না ভেবে দেখ! উপস্থিত ইহুদী জনতা বলল, বলুন! সেই প্রস্তাবগুলো কী?

কাব বলল, ‘আমার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, আমরা মুহাম্মাদের ঈমান আনয়ন করব, তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নেব এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেব। খোদার কসম! তোমাদের কাছে ইতিমধ্যেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তিনি যে আল্লাহর রাসূল এবং তিনিই সেই ব্যক্তি যার আলোচনা তোমরা তাওরাতে পেয়েছ। কাজেই তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের ধন-সম্পদকে এবং আপন স্ত্রী-সন্তানদেরকে বাঁচানোর স্বার্থে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর।’

সর্দারের এই প্রস্তাবে বনু কুরাইযার ইহুদীরা বিস্ময়ভরে একজন আরেকজনের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাউয়া-চাউয়ি করতে লাগল। তারা চরম ঔদ্ধত্য ও দাঙ্কিতার সাথে জবাব দিল, ‘আমরা কখনোই তাওরাতের হুকুমকে পরিত্যাগ করব না। তাওরাতের পরিবর্তে অন্য কিছুকে কিছুতেই আমরা গ্রহণ করব না।’

কাব বলল, ‘ঠিক আছে, প্রথম প্রস্তাবে সম্মত না হলে দ্বিতীয় প্রস্তাবের কথা বলছি। দেখ! তোমরা যুদ্ধ করা বাদ দিয়ে কাপুরুষের মতো ঘরে বসে আছ। কারণ তোমরা তোমাদের মহিলা ও শিশুদের বিষয়ে শঙ্কিত। তোমাদের অবর্তমানে তাদের কী হবে, তারা কী স্বধর্ম ত্যাগ করবে, এ জাতীয় আশঙ্কার কারণে তোমরা যুদ্ধ করার সাহস বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছ না। কাজেই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, তোমরা তোমাদের মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে ফেল। এরপর সকল পুরুষ উন্মুক্ত তরবারী হাতে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। এক্ষেত্রে তোমাদের কোনো পিছুটানের শঙ্কা থাকবে না। কাজেই ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। যদি তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও তাহলে তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে কোনো শঙ্কা থাকবে না। আর যদি বিজয়ী হও, তাহলে আমার জানের শপথ! তোমরা আবারও স্ত্রী-সন্তান পেয়ে যাবে।’

তারা এ প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করে ওঠল। বলল, আমরা কী এই অসহায় মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে পারি? তাহলে এদের পর নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থকতা কী?

কাব বলল, ‘এ প্রস্তাবেও সম্মত না হলে তৃতীয় প্রস্তাব শোন! আজ শনিবার রাত। হয়ত মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীরা এ রাতে নিশ্চিন্ত থাকবে। কারণ তা

তোমাদের পবিত্রতম দিন। এ রাতে তোমরা যুদ্ধে জড়াবে না। কাজেই কেল্লা থেকে নেমে তোমরা তাদের আক্রমণ কর। হয়ত ধোঁকা দিয়ে তোমরা মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের পরাস্ত করতে পারবে!’

কিন্তু এ প্রস্তাবেও তারা বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করতে লাগল। তারা বলল, আমরা কী আমাদের পবিত্র শনিবারের মর্যাদাকে কলুষিত করতে পারি? শনিবারে কী আমরা তা করতে পারি যা আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্য হতে একদল লোক ছাড়া কেউ করেনি? যারা করেছিল তাদের মুখমণ্ডল যে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এ ইতিহাস তো আমাদের চোখের সামনে, আমরা সবাই তা জানি! কাজেই জেনেশুনে আমরা এমন অপরাধে লিপ্ত হতে পারি না।

এরপর কাব কিছুক্ষণ নীরব মনে এসব ভীতুদের নিয়ে ভাবতে লাগল, যাদের মাঝে কোনো সংকল্প নেই, পরিবর্তনের মনোবল নেই, দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই, সত্যের পথে ফিরার কোনো সদিচ্ছা নেই, এদের পরিণতি কী হবে? এরপর সে তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলল, খোদার কসম হে ইহুদীরা! মায়ের গর্ভ থেকে প্রসব হওয়ার পর যুগে যুগে তোমাদের কেউ কখনো কোনো প্রত্যয় নিয়ে একটি রাতও পার করতে পারনি।

ইহুদীদের এ পারস্পরিক শলাপরামর্শের পর আরো কিছুদিন অতিক্রান্ত হল। ইহুদীরা অজানা শঙ্কা ও কঠিন মসীবতে দিন পার করতে লাগল। এদিকে কিছু সাহাবি কেল্লার উপর আক্রমণ করার দৃঢ় সংকল্প করলেন আর ওদিকে বনু কুরাইয়াও করণীয় বিষয়ে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তাদের মনে হল, তারা তো ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে আউস গোত্রের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। আর আউস গোত্রপ্রধান সাদ বিন মুআজ তো আজ মুসলমান। তিনি আনসারদের সর্দার। এই ভেবে তাদের চেহারা উজ্জল হয়ে ওঠল। তারা সাদ বিন মুআজের সুপারিশের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন দেখতে লাগল।

এরপর একদিন ভোরে কেল্লার উপর থেকে তারা ঘোষণা করল, ‘হে মুহাম্মাদ! সাদ বিন মুআজকে আমাদের ফয়সালাকারী নিযুক্ত করা হলে আমরা নেমে আসতে প্রস্তুত।’ কী আশ্চর্য! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত! অথচ তারা সাদ বিন মুআজের ফয়সালা মেনে নেমে আসবে!!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছিলেন তাদের একটা চূড়ান্ত পরিণতি হয়ে যাক। ফলে তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তাদেরকে শর্ত মোতাবেক কেবল থেকে নেমে আসতে আদেশ করলেন এবং সাদ বিন মুআজকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন।

সাদ বিন মুআজ ছিলেন আহত। তাকে মসজিদের কাছে একটি তাবুতে রেখে শ্রমশ্রম করা হচ্ছিল। সেখানে আরো রোগী ও তাদের সেবার জন্য কিছু লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে সাদের গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিয়ে আসার জন্য রওনা হল। তারা সেখানে পৌঁছে দেখেন, সুঠাম দেহের অধিকারী ও সুদর্শন সাদ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। প্রচণ্ড আঘাতে আহত হয়ে তিনি ক্রমেই নিশ্বেজ হয়ে পড়ছেন।

লোকেরা তাঁর কাছে একটি গাঁধা নিয়ে এল। গাঁধার পিঠে চামড়ার একটি বালিশ বিছিয়ে দেয়া হল। তারপর তাঁকে গাঁধার পিঠে উঠানো হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর তোমাদের? তারা জবাব দিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও বনু কুরাইযার মাঝে ফয়সালা করার জন্য আপনাকে ডেকেছেন।

এ কথা শুনে সাদ হতবাক হয়ে গেলেন যে, এটা কেমন কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে তিনি করে ফয়সালা করবেন! এটা কী করে সম্ভব! লোকেরা তাঁকে জানাল যে, বনু কুরাইযা কেবল তাঁকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করার শর্তেই আত্মসমর্পণ করেছে।

এ কথা শুনে সাদ নীরব হয়ে গেলেন। নীরবে পথ চলতে লাগলেন। চলার ফাঁকে ফাঁকে স্বগোষ্ঠীয় লোকেরা তাঁকে বারবার অনুরোধ করল, হে আবু আমর! (সাদের উপনাম) আপনি আপনার বন্ধুগোত্রের সাথে সদাচারণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপনাকে এজন্যই ক্ষমতা দিয়েছেন যেন আপনি তাদের প্রতি সদাচারণ করতে পারেন।

লোকেরা যখন এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন তিনি বললেন, 'আজ সাদ বিন মুআজের সুযোগ এসেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির মোকাবেলায় কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে পরোয়া না করার।'

হযরত সাদ বিন মুআজ বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে এক দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন ও আরেক দিকে বনু কুরাইযা অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাদ বিন মুআজকে আহত দেখতে পেলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, যাও। তোমাদের সর্দারকে এগিয়ে নিয়ে এস। সাহাবায়ে কেরাম সাদ বিন মুআজকে গাঁধার পিঠ থেকে নামতে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং তাঁকে নামিয়ে আনলেন।

সওয়ারী থেকে নেমে হযরত সাদ বিন মুআজ প্রথমে ইহুদীদের প্রতি তাকালেন আর ভাবলেন, এরা তো সেই সম্প্রদায় যারা আমানতের খিয়ানত করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। যারা হাসসান বিন সাবেরের কেল্লায় আক্রমণ করেছিল যেখানে মুসলিম নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিল। যারা কুরাইশদের অস্ত্র ও খাদ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। তিনি ভাবলেন, এরা তো সেই সম্প্রদায় যাদের মাঝে মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষী যুদ্ধবাজরা রয়েছে। যারা অঙ্গিকার করে বারবার তা ভঙ্গ করেছে। কাজেই তাদের আর বিশ্বাস করা যায় না।

সাদ এসব ভাবছিলেন। ওদিকে সাদের ফয়সালার অপেক্ষায় সকলে অপেক্ষমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলমান ও ইহুদী সকলের নজর তখন সাদের দিকে।

হযরত সাদ বিন মুআজ ইহুদীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে বনু কুরাইযা! আল্লাহর শপথ করে বল! ফয়সালা কী তাই হবে যা আমি ফয়সালা করব?

তারা জবাব দিল, হ্যাঁ। তাই হবে।

একই প্রশ্ন রাসূলুল্লাহকে করার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ'র দিকে তাকালেন, কিন্তু ভীষণ লজ্জায় তিনি আরষ্ট হয়ে গেলেন। মূলত তিনি প্রথম থেকেই লজ্জিত ছিলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে তিনি কিভাবে ফয়সালা করবেন? ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর দিকে না তাকিয়ে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে ছিলেন সেদিকে হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, যিনি এদিকে আছেন তিনিও কি সম্মত?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

এরপর হযরত সাদ সামান্য সময় নিশ্চুপ রইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধীর অপেক্ষায় কান পেতে রয়েছেন; সাদের ফয়সালা শোনার জন্য।

সাদের রোগ ও ব্যথ্যা তখন তীব্র আকার ধারণ করছিল। এমনকি তাঁর কথার আওয়াজও ঠিকমত শোনা যাচ্ছিল না। এমন সময় হযরত সাদ বিন মুআজের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, ‘আমি ফয়সালা করছি, বনু কুরাইযার যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে। আর তাদের সম্পত্তি মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে।’

মুসলমানরা আনন্দে ভাসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে বললেন, ‘হে সাদ! তুমি তো সে ফয়সালাই করেছ নিখিল জাহানের অধিপতি সাত আসমানের উপর থেকে যে ফয়সালা করেছেন।’

এরপর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বনু কুরাইযার যোদ্ধাদেরকে এক জায়গায় সমবেত করা হল। তাদের নজরদারীতে রাখতে লোক নিয়োগ করা হল। তাদের মাঝে এক অন্ধ ছিল যার নাম যুবায়ের বিন বাতা। তিনি ছিলেন তাদের মাঝে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ। সত্য গ্রহণের, জীবনের গতিপথ পাল্টানোর প্রচুর সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়ার সংসাহস তার হয়নি।

যুবায়ের বিন বাতা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, একদিন সে তার কিছু সাথীকে নিয়ে ঘুরতে বের হল। সাথীরা তাকে জানাল, আকাশে লাল নক্ষত্রটি উদিত হয়েছে।

সে বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করল, লাল নক্ষত্র উদিত হয়েছে?

বলা হল, হ্যাঁ। তাই উদিত হয়েছে।

সে বলল, ‘এ নক্ষত্রটি কেবল সে সময় উদিত হয় যখন কোনো নবীর আগমন ঘটে। আর নবী তো কেবল একজনই অবশিষ্ট রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন, আহমাদ। আর এই মদীনা হবে তাঁর হিজরতস্থল।’ এ সব সত্য জুবায়েরের মতো অনেক ইহুদীরই জানা ছিল।

জুবায়ের জ্ঞানী ছিল। সে নিয়মিত তাওরাত পাঠ করত। কেবল সে একাই নয়, তাওরাতের জ্ঞানসম্পন্ন সকল ইহুদীন এ সত্য সম্পর্কে জানত, কিন্তু

জানার পরও সে বা তারা ইসলামে প্রবেশ করেনি। অধিকন্তু জুবায়ের ছিল আগাগোড়া এক চরম মুসলিম বিদ্রোহী। এটা সত্য যে, শারীরিকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তবে যুদ্ধান্ত্র সরবরাহ করে শত্রু বাহিনীকে সে সাহায্য করেছিল। তাদেরকে যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ ও অর্থ দিয়েছিল। শারীরিক অক্ষমতা হেতু ময়দানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারায় সে হতাশা ব্যক্ত করে বলত, হায়! দৃষ্টিসম্পন্ন হলে আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমিও অংশগ্রহণ করতে পারতাম!

বনু কুরাইযার অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে জুবায়েরও যুদ্ধবন্দী ছিল। ইত্যবসরে হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস সেখানে আগমন করলেন। জুবায়েরকে দেখে হযরত সাবেতের মনে পড়ল; ইসলাম পূর্ব যুগে এই ইহুদী তো একবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল। আজ সে বিপদগ্রস্ত। কাজেই তাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। তিনি তার প্রাণ রক্ষা করে অতীতের সেই এহসানের বদলা দিতে চাইলেন। সাবেত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যুবায়ের! তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?

অন্ধ যুবায়ের তার স্মৃতিতে হাতড়াতে লাগল। মনে করতে চেষ্টা করল এই আওয়াজ কোথায় শুনেছে? কিছুক্ষণ ভেবে বলল, হ্যাঁ। কেন মনে থাকবে না? আমার মতো ব্যক্তি তোমার মতো মানুষকে কী করে ভুলতে পারে? তুমি কি সাবিত বিন কায়েস নও?

সাবেত জবাব দিলেন, হ্যাঁ। বহু বছর আগে জাহেলী যুগে তুমি আমার প্রতি এহসান করেছিলে, আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলে। আজ আমি তোমার সেই এহসানের প্রতিদান দিতে চাই।

এ কথা শুনে যুবায়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, নিশ্চয়ই মর্যাদাবান তার মর্যাদার কদর করতে জানে।

হযরত সাবেত ইহুদী সর্দার যুবায়েরের সুপারিশের জন্য রাসূলুল্লাহ'র দরবারে হাযির হলেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই লোকটি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল। সে আমার প্রতি জাহেলী যুগে একবার এহসান করেছিল। আজ আমি তাকে সেই এহসানের বদলা দিতে চাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার ব্যাপারে সুপারিশ করছি। আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।'

সাবেতের সুপারিশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়েরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাকে হত্যা থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। সাবেত খুশী মনে সুসংবাদ দেয়ার জন্য দ্রুত যুবায়েরের কাছে ছুটলেন। গিয়ে বললেন, হে যুবায়ের! সুসংবাদ গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই তুমি এখান থেকে চল। দ্রুত এ এলাকা ত্যাগ কর।

যুবায়ের তাঁর সাথে পথ ধরল। খুশীতে সে যেন পা ফেলতে পারছিল না, কিন্তু কয়েক কদম চলার পর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? থেমে গেলে কেন?

যুবায়ের জবাব দিল, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। সহায় নেই। স্ত্রী নেই। সন্তান নেই। এই নিঃসঙ্গ জীবন দিয়ে সে কী করবে? সাবেত বললেন, ঠিক আছে, তুমি অপেক্ষা কর। এই বলে হযরত সাবেত আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যুবায়ের তার স্ত্রী ও সন্তানদের ফেরত চায়। সে আক্ষেপ করছে অন্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তি; তার পরিবারের একান্ত প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে যুবায়েরের স্ত্রী-সন্তানদেরও মুক্ত করে দেয়া হল। হযরত সাবেত তাদের নিয়ে যুবায়েরের কাছে এলেন। তারা যুবায়েরকে জীবিত দেখতে পেয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে কেঁদে ফেলল। তাকে জড়িয়ে ধরে তারাও কাঁদল। যুবায়েরও কাঁদল। এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল। সকলে সাবেতের শোকরিয়া আদায় করল।

কিছুদূর যাওয়ার পর যুবায়ের আবারও থমকে দাঁড়াল। বলল, বৃদ্ধ মানুষ; স্ত্রী সন্তান নিয়ে হেজ্জায়ের এই মরু অঞ্চলে সহায়-সম্পদ ছাড়া কিভাবে জীবন বাঁচাবে?

সাবেত বললেন, ঠিক আছে, দাঁড়াও। তিনি আবার রাসূলুল্লাহর দরবারে এলেন। আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যুবায়ের বলছে, সে বৃদ্ধ মানুষ। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে হেজ্জায়ের এই মরু অঞ্চলে সহায়-সম্পদ ছাড়া কিভাবে জীবন বাঁচবে? তার সম্পদের একান্ত প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তার সম্পত্তি মুক্ত করে নিয়ে যাও।' হযরত সাবেত যুবায়েরের সম্পদ মুক্ত করে নিয়ে যুবায়েরের কাছে এসে বললেন, 'যুবায়ের! তুমি আর কী চাও? তোমার স্ত্রী-সন্তান, ধন-সম্পদ ও প্রাণ সবকিছুই পেয়ে গেলে। চল এখন দ্রুত এলাকা ত্যাগ করি।' যুবায়েরও সাবেতের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত উঠে দাঁড়াল।

স্ত্রী-সন্তান ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে সামনে কয়েক কদম অগ্রসর হতেই তার স্বজাতির কথা মনে পড়ল। কিছুক্ষণ পূর্বেও সে তাদের সাথেই ছিল। সে অন্ধ বিধায় জানে না, তাদের কে বেঁচে আছে কে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছে। যুবায়ের বিন বাতা আবার থমকে দাঁড়াল। হযরত সাবেতের দিকে মুখ ফিরাল। জিজ্ঞেস করল, হে সাবেত! আমাদের সেই সর্দারের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে যার দীপ্ত চেহারায় জনপদের কৌমার্য ঝলসে ওঠত?

সাবেত জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার কথা বলছ?

সে জবাব দিল, আমি আমাদের সর্দার কাব বিন আসাদের কথা বলছি।

সাবেত জবাব দিলেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

এরপর যুবায়ের কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল। কিছুদূর পথ চলার পর আবার সাবেতের দিকে মুখ ঘুরাল। জিজ্ঞেস করল, আমাদের নগর ও পল্লী তথা সকলের অবিসংবাদিত সর্দারের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে?

সাবেত জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার কথা বলছ?

সে জবাব দিল, হুয়াই বিন আখতাবের কথা বলছি।

সাবেত বললেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ চলার পর যুবায়ের আবার জিজ্ঞেস করল, আমাদের দুর্দিনের বন্ধু, আমাদের সংকটকালে যে স্বজন হত আর পলায়নকালে আশ্রয় হত; আমাদের সেই সর্দারের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে?

সাবেত জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ?

সে বলল, আযাল বিন শামুলের ব্যাপারে বলছি।

সাবেত জবাব দিলেন, তাকেও হত্যা করা হয়েছে।

যুবায়ের এবার আত্ননাদ করে ওঠল। বলল, আমাদের সর্ব সভাপতিদের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে; যাদের কাছে আমরা সকলে জড়ো হতাম?

সাবেত জিজ্ঞেস করলেন, কাদের বিষয়ে বলছ?

সে জবাব দিল, বনু কাব বিন কুরাইয়া ও বনু আমর বিন কুরাইয়ার কথা বলছি।

সাবেত জবাব দিলেন, তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে।

এ কথা বলতেই যুবায়ের একেবারে নিখর, নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যুবায়েরের জন্য এ সময়টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়টা ছিল ইসলাম কবুল করবে কী করবে না; এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়।

ভাইয়েরা আমার! এর দৃষ্টান্ত কী হতে পারে; ভেবেছেন কি?

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যে জুমআর নামায আদায় করতে এসেছে। খতীব সাহেব মিম্বারে ধূমপান ও অবৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। সে নিয়মিত এসব আলোচনা শুনে এবং ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সে নিজেও জানে। তারপরও সে তা ত্যাগ করতে পারে না। আজ আমার বন্ধুদের ধূমপানের সাথে সম্পর্ক এত গভীর ও গাঢ় যে তাদের পকেটে থাকে সিগারেটের বাস্ক। গাড়িতে থাকে আরেকটি বাস্ক। তার ঘুমের খাটের কাছে সিগারেটের বাস্ক আবার তার অফিসেও সিগারেটের বাস্ক। তার যত বন্ধুবান্ধব তারাও ধূমপায়ী। সে নিজেও ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই ব্যক্তি কিভাবে নিজেকে পরিবর্তন করবে?

এমনিভাবে যে ব্যক্তির আয় উপার্জন হারাম কিংবা যার পরনারীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বা কোনো যুবতী নারী, যার কোনো পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। সবার একই অবস্থা। সবাই জানে, তার কাজ অবৈধ, অথচ তা বর্জন করতে পারে না। এদের প্রত্যেকেরই নিজের মাঝে পরিবর্তন আনার দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার প্রয়োজন।

যুবায়ের বিন বাতার ইতিহাস ছিল এই। তার সামনে সুযোগ এসেছিল। সত্য তার সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা একটিই, সে কি তার বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাবে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োজন বীরত্ব ও সংগ্রামের, বরং প্রয়োজন এমন আপোষহীন

বীরবিক্রমের; সত্যের পথে চলতে যার সামনে গোটা দুনিয়া তুচ্ছ। কালেমার সাহসী উচ্চারণ এমন ব্যক্তির প্রকৃতার্থে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এমন ব্যক্তি দুনিয়াতেও সফল। আখেরাতেও সফল।

যুবায়ের ভাবতে লাগল। সাবেতের দিকে তাকিয়ে বলল, সাবেত! তুমি কি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাচ্ছ?

সাবেত বললেন, হ্যাঁ। যুবায়ের বলল, তাহলে আমাকেও আমার স্বজাতির কাছে পৌঁছে দাও। কারণ আল্লাহর শপথ! এ সকল ব্যক্তিগণের মৃত্যুর পর জীবনে বেঁচে থাকার কোনো স্বাদ নেই। আমি আমার প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছা অঙ্গি ধৈর্যধারণ করতে পারছি না।

হযরত সাবেত তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হতে চাচ্ছিল। কাফের অবস্থায় মরণকে সে বরণ করছিল। ফলে যা হবার তাই হল। জীবনের শেষ মানষিলে এসে সাহসিকতায় পরিচয় দিতে সে ব্যর্থ হল। কাপুরুষতা ও দুর্বলতাকেই সে গ্রহণ করল। এ সুযোগকে যদি সে কাজে লাগাত, জীবনকে পরিবর্তন করত, তাতে তার কোনোই সমস্যা হত না, বরং দুনিয়া ও আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণই সে লাভ করত! কিন্তু স্বজাতির ভালোবাসা, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে লালনের অন্ধ আবেগ তাকে ফেরার সুযোগ দেয়নি।

এভাবে আজো বহু মানুষ সুযোগগুলোকে হেলায় হারায়। কত সুযোগ মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে! কত রহমতের কাফেলা তার পাশ দিয়ে ছুটে চলে। কিন্তু তাতে शामिल হওয়ার অবসর তার নসীব হয় না। রমযান আসে, রমযান চলে যায়, তবু তার মাঝে পরিবর্তন আসে না। রমযানের আগে যে নামায ছিল, রমযানের পরও সেই একই নামায। রমযানের আগে যে যবান ছিল, রমযানের পরও একই যবান, একই কথাবার্তা, একই নজর!

হায়! আফসোস সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষুধা যার নফসকে সংশোধন করতে পারেনি! রুকু-সিজাদগুলো যার মাঝে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। দীর্ঘ একটি মাস ধারাবাহিক রোযা; কোনো কিছুতেই তার কিছু অর্জিত হল না!

কী আশ্চর্য! কোথায় আপনার রোযার ভূমিকা? কোথায় রাতভর নামাযের প্রভাব? রমযানে এত কাঁদলেন, এত ভীত ও বিনয়ী হলেন, কোথায় গেল পেরেশানীর ছাপ?

রমযান হচ্ছে সালফে সালেহীনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, সাদেকীনের গনীমত আর মুমিনের প্রশান্তি ও আনন্দ। রমযানের রাত হচ্ছে যামানার মাথার মুকুট। আহলে ঈমানের অফুরন্ত সুযোগ।

যখন ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়, আমার চোখে তখন নদী বয়ে যায়। তখন আমার এ মর্মস্পর্শী কবিতাংশটি মনে পড়ে যার মর্মার্থ হচ্ছে, 'এটা কি চরম ক্ষতি নয় যে এ রাতগুলো কেটে যাচ্ছে; কোনো বিনিময় ও পুরস্কার ছাড়া। অথচ এ সময়গুলোকে আমার জীবন থেকে হিসাব করা হবে?

পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবল

ইসলামে এসলাহে নফস তথা ভুলগুলো শুধরে নিয়ে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এসলাহে নফস অর্জন করা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই। এসলাহে নফসের জন্য, নিজেকে এবং অপরকে সংশোধনের জন্য, জীবনের ভুলগুলো শোধরানোর জন্য প্রয়োজন সংকল্প ও সাহস। রমযান আমাদেরকে এ মনোবল ও সাহসিকতা যোগান দেয়। তাই প্রথমে আমাদের রবের সাথে আমাদের সম্পর্কের সংশোধন করতে হবে। তাঁর সামনে নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দিতে হবে। ভাবতে হবে, আমি তো গোলাম। তিনি আমার মনিব। আমি অভাবগ্রস্ত। তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো কাছে মুখাপেক্ষী নন। তিনি মহাপরাক্রমশালী। আমি দুর্বল। তাঁর সামনে নিজের দুর্বলতার নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি পেশ করতে হবে।

খলীফা নাসেরের যামানা। যমীন শুকিয়ে গেল। চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করল। মুনযির বিন সাঈদ আলবালুতি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। খলীফা তাঁকে জনগণকে নিয়ে সালাতুল ইস্তিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

তিনি বের হতে যাবেন, এমন সময় মনে হল, খলীফা এখন কী অবস্থায় রয়েছেন, তা দেখে গেলে ভাল হয়।

গোলামকে বললেন আমি এখনই সালাতুল ইস্তিসকা আদায়ের জন্য বের হব। তুমি যদি জলদি গিয়ে দেখে আসতে; খলীফা কী করছেন, তাহলে ভাল হয়! তাই তুমি জলদি যাও। কৌশলে দেখে এস, তিনি কী করছেন?

গোলাম গিয়ে অল্প সময় পরই ফিরে এল। বালুতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখেছ?

গোলাম জবাব দিল, আজকের মতো এত বিনয়ী ও ভীত আমি আর কখনো তাকে দেখিনি। তিনি একাকী একটি ঘরে, মোটা কাপড় পরে, মাটিতে বসে জোরে জোরে কান্না করছেন, নিজের অপরাধ স্বীকার করছেন। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আমার ভাগ্য তোমারই কুদরতী হাতে। তুমি তো সমস্ত বিচারকদেরও বিচারক! তুমি কি আমার অপরাধের কারণে তোমার বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে চাও?

গোলামের মুখে এই কথা শুনে বালুতির চেহারা উজ্জল হয়ে ওঠল। বললেন, যাও! ছাতা নিয়ে এস। যমীনের প্রতাপশালী যখন বিনীত হয়েছে, আসমানের প্রতাপশালী তখন নিশ্চয়ই দয়া করবেনই।

আমাদের রোযা কী আমাদের মাঝে খলীফা নাসেরের সেই গোলামীর অনুভূতি জাগাতে পারে না?

যে অবস্থাতেই থাকুন শোকরগুয়ার হোন

আমাদের মাঝেও এই অনুভূতি থাকতে হবে যে, আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ কত মহান। আমাদের তিনি মুসলিম বানিয়েছেন। মূর্তিপূজারী বানাননি। গরুপূজারী হিন্দু বানাননি। ইহুদী বা খৃষ্টান ঘরে জন্ম দেননি। আমাদেরকে তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম বানিয়েছেন। আমার কত সৌভাগ্য যে, আমি সেই মহান রবের গোলাম যার সমকক্ষ কেউ নেই।

একবার কোনো এক শাসক এক ব্যক্তিকে বন্দী করল। দীর্ঘ দিন ওই ব্যক্তিকে বন্দী জীবন কাটাতে হয়। এ সময় তার এক বন্ধু তাকে চিঠি লিখল, ‘আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন; তার শোকরিয়া আদায় কর এবং ধৈর্যধারণ কর।’ কিছুদিন সাধারণ বন্দীর মতো কাটানোর পর একদিন সুলতানের নির্দেশে তাকে চাবুকাঘাত করা শুরু হল। ইত্যবসরে তার বন্ধু তাকে লিখে পাঠাল, ‘আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় কর।’ কিছুদিন চাবুকাঘাতের শাস্তি ভোগ করার পর সুলতানের নির্দেশে তার পায়ে বেড়ী পরিয়ে কারাবদ্ধ এক অগ্নিপূজারীর সাথে তাকে বেঁধে রাখা হল। এ শাস্তিটি ছিল সহ্যসীমার বাইরে।

একদিন সহবন্দী অগ্নিপূজারীর হঠাৎ পেটব্যথ্যা আরম্ভ হল। এক সময় তা দাস্তে রূপ নিল। দিনরাতে বহুবার তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে এস্টেঞ্জায় যেতে হত। যতবারই সে এস্টেঞ্জায় যেত ঐ ব্যক্তিরও তার সাথে যেতে হত। কারণ সে তার সাথেই বাঁধা ছিল। অগ্নিপূজারী প্রয়োজন পূরণ করত আর সে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। এতে সে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে ওঠল। এরই মাঝে আবার বন্ধুর পত্র এল, 'আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় কর। পেরেশান হয়ে না।' পত্র পাঠে তার রাগ আরো চরমে পৌঁছল। রাগে সে লিখে পাঠাল, 'কিসের ভিত্তিতে আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করব? আমি যে অবস্থায় আছি; এর চেয়ে আর বিপদের কী হতে পারে?' বন্ধু জবাবে লিখল, 'তুমি যদি অগ্নিপূজারী হতে আর প্রদীপের ফিতার স্থলে যদি তোমাকে রাখা হত তাহলে তুমি কী করত? কাজেই তোমার দ্বীন নিরাপদ রয়েছে সে জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় কর। আর দুনিয়া ছুটে গেছে বলে দিশেহারা হয়ে যেয়ো না।'

বাস্তবেই আরশ ও মহাকাশের অধিপতির সাথে আপনার সম্পর্ক যখন গাঢ় হবে তখন দুনিয়া ছুটে গেছে বলে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। কবিতা-

فليتك تحلو والحياة مريرة * وليتك ترضى الأنام غضاب

وليت الذي بيني وبينك عامر * وبينى وبين العالمين خراب

إذا صح منك الود فالكل هين * وكل الذي فوق الزاب تراب

অর্থ : তুমি যদি মধুর হতে, জীবন হত দৃঢ়। তুমি যদি সন্তুষ্ট হতে আর সৃষ্টিকূল হত রুঢ়। তোমার আর আমার মাঝে যা ব্যবধান তাই যদি হত আবাদ! আমার আর জগতের মাঝে হত যদি সব বরবাদ! তোমার ভালবাসা যদি সত্যি হয় জগত তাহলে নস্যি। শরারের উর্ধ্বে যা কিছু, সবি তখন মাটি।

রোযাদার ভাইয়েরা!

রমযান হচ্ছে ইবাদতের পাথেয় সংগ্রহের সুবর্ণ সময়। এটা মুসলমানদের হৃদয়কে নিষ্কলুষ হিসেবে গড়ারও এক চমৎকার সুযোগ। কাজেই আমরা যেন রমযানে আমাদের কলবকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।

কাজেই তাতে যেন কোনো হিংসা ও বিদ্বেষের কোনো ছিটে-ফোটাও না থাকে।

মুমিনের আত্মার স্বচ্ছতা

আমরা যদি সালফে সালেহীনের দিকে তাকাই তাহলে তাদের হৃদয়কে কলুষতা মুক্ত করার বিস্ময়কর সব ঘটনা দেখতে পাব। নিজের দুশমন ও চরম অপরাধীদের সাথেও তারা খোলা মনে, স্বচ্ছ হৃদয়ে মেলামেশা করতেন। মানুষের ভুলগুলো তারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে নিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বিবি উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিইয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব আগে ইহুদী ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরও কিছুকাল তিনি জীবিত ছিলেন।

হযরত ওমরের খিলাফতকালে তাঁর এক দাসী খলীফা হযরত ওমরের কাছে এল। তাঁর কাছে এসে অভিযোগ জানাল যে, ‘সাফিইয়া শনিবার (ইহুদীদের কাছে সম্মানিত দিন) দিনটিকে খুবই ভালোবাসে ও সেদিনটিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং ইহুদীদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখে।’

এ তথ্য পেয়ে হযরত ওমর রাযি. বিষয়টি তদন্তের জন্য উম্মুল মুমিনীনের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! ব্যাপারটি আসলে কী? তিনি জবাব দিলেন, শনিবারের বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আমাকে জুমআর দিন দেয়ার পর থেকে শনিবারের ক্ষেত্রে আমার কোনো ভালোবাসা নেই। আর ইহুদীদের মধ্যে আমার কিছু আত্মীয় আছে। তাদের সাথেই আমি সম্পর্ক বজায় রাখি। এতদশ্রবণে ওমর রাযি. তাঁর জন্য দুআ করলেন।

হযরত সাফিইয়া বুঝে ফেললেন যে, তাঁর দাসীই হযরত ওমরের কাছে গিয়ে তাঁর নামে অপবাদ ছড়িয়েছে। ফলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তুমি এমন করলে? দাসী ভয় পেয়ে গেল। জবাব দিল, শয়তান

আমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। এরপর দাসী কিছুক্ষণ চুপ থাকল। অপেক্ষা করল, দেখা যাক, সাফিইয়া তার সাথে কী আচরণ করেন? কিন্তু উম্মুল মুমিনীন ক্রোধ সম্বরণ করে নিলেন এবং বললেন, 'যাও! তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমি তোমায় মুক্ত করে দিলাম।' এভাবেই তারা স্বীয় শত্রুর সাথেও সদাচারণ করতেন।

হযরত ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী রহ. একবার দজলা নদীর নিকটে গেলেন। নদীর তীরে গিয়ে পাগড়ী খুলে অযু করতে নদীতে নামলেন। তাঁর পাগড়ী ছিল বিশ দ্বীনার সমমূল্যের। ইত্যবসরে এক চোর এল। সে ইমাম সাহেবের পাগড়ীখানা নিয়ে সেখানে একটা কম দামী বাজে পাগড়ী রেখে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। ইমাম আবু ইসহাক অযু শেষে চোরের রেখে যাওয়া পাগড়ীটি মাথায় পরে নীরবে প্রস্থান করলেন। চুরির বিষয়টি তাঁর নজরে ধরা পড়ল না। এরপর যখন তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দরসে বসলেন, তখন ছাত্ররা তাঁকে অবহিত করল যে, 'হযরত! মাথার পাগড়ীটি আসলে আপনার নয়। নিশ্চয়ই কোনো চোর আপনার সেই মূল্যবান পাগড়ীটি নিয়ে সেখানে এই সাধারণ নিম্নমানের পাগড়ী রেখে গিয়েছে।' ছাত্রদের মাধ্যমে যখন তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন তখন ছাত্ররা অপেক্ষা করছিল, এই বুঝি শায়েখ রেগে যাবেন আর চোরের বিরুদ্ধে বদদুআ করবেন, কিন্তু না শায়েখ বললেন, 'আল্লাহ তাকে তাঁর ও আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা করুন। হযরত কোনো প্রয়োজনেই সে আমার পাগড়ীটি নিয়ে থাকবে।'।

কতইনা চমৎকার হত যদি আমাদের সেই দুঃসাহস থাকত, যার মাধ্যমে আমরা শয়তানের নাসিকাকে পদদলিত করতে পারতাম আর অন্যদের মনে আমাদের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে তা দূর করতে পারতাম! আমরা চাইলে মানুষের হিংসা ও বিদ্বেষকে মুচকি হাসি ও বিনম্র আচরণের মাধ্যমে দূর করতে পারি। তার চেয়ে উত্তম পন্থা হতে পারে, যদি আমরা সালাম দ্বারা সূচনা করি কিংবা উপযুক্ত কোনো হাদিয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করি। হাদিস শরীফে এসেছে, 'পরস্পর হাদিয়া দাও, মহব্বত তৈরি হয়ে যাবে।' কিংবা মানুষের বিদ্বেষকে আমরা দূর করতে পারি সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচারণের পরিবর্তে বিনম্র ও অকপট আন্তরিকতা প্রকাশের মাধ্যমে। তেমনি ঐকান্তিকতাপূর্ণ কোনো চিঠি পাঠানোর মাধ্যমেও আমরা পারস্পরিক দূরত্বকে দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি।

হযরত মিসওয়ার বিন মাখযামা একবার সিরিয়া সফর করছিলেন। সফরকালীন হযরত মুআবিয়া রাযি.এর দরবারে গিয়ে উপনীত হলেন। তাঁকে স্বীয় প্রয়োজনের কথা জানালে মুআবিয়া তা পূরণের ব্যবস্থা করলেন। হযরত মুআবিয়ার নিকট আগেই সংবাদ পৌঁছেছিল যে, মিসওয়ার তাঁকে এবং তাঁর বিভিন্ন গভর্ণরকে প্রকাশ্যে দোষারোপ করে থাকেন। এমনকি তাঁর বিশেষ কোনো ব্যক্তির কাছেও তিনি তাঁর বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

দরবারে মানুষের ভীড় যখন কমে গেল তখন হযরত মুআবিয়া হযরত মিসওয়ারের সাথে একান্তে মিলিত হলেন। বললেন, হে মিসওয়ার! আমার গভর্ণরদের ব্যাপারে আপনার আপত্তির কারণ কী? মিসওয়ার বললেন, রাখুন ওসব কথা। আমাকে দ্রুত বিদায় করুন, তাহলেই আমার প্রতি এহসান হবে। কিন্তু মুআবিয়া তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বললেন, না। আপনাকে বলতেই হবে, কেন আপনি আমাকে ও আমার গভর্ণরদেরকে দোষারোপ করেন। নয়ত আমার দোষারোপ করতে করতে আপনার জীবন পার হয়ে যাবে, অথচ আমি জানব না, কেন আপনি এমন করতেন।

এবার মিসওয়ার মুখ খুললেন। মুআবিয়া সম্পর্কে এতদিন তিনি কী কী বলেছেন সব বলে দিলেন।

শুনে মুআবিয়া বললেন, দেখুন! আমি তো গোনাহ থেকে মুক্ত নই। মিসওয়ার! আপনি কি আমার সাথে এই মর্মে ওয়াদা করবেন যে, আপনি সাধারণ মানুষের সংশোধনার্থে যা প্রয়োজন তা করবেন? কারণ তাতে দশগুণ সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে। নাকি আপনি এহসানের পথ পরিহার করে গোনাহের ওয়াদা করবেন?

মিসওয়ার বললেন, আলোচনা তো গোনাহেরই হয়ে থাকে।

মুআবিয়া বললেন, তাহলে আমি আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করছি, কিন্তু হে মিসওয়ার! আপনার কি এমন কোনো গোনাহ নেই যা ক্ষমা না করা হলে আপনি নিজের ধ্বংসের আশঙ্কা করেন?

মিসওয়ার বললেন, হ্যাঁ, রয়েছে।

মুআবিয়া বললেন, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমার আশায় কিসে আপনাকে আমার চেয়ে অগ্রগামী করবে? আল্লাহর কসম! আপনার চেয়ে সংশোধনের

ক্ষমতা আমার বেশি নয়। তেব এটাও সত্য যে, আমি দু'বস্তু তথা আল্লাহ ও গাইরুল্লাহর মাঝে কোনো একটিকে গ্রহণে কোনো নির্বাচন করব না। আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য কিছুকে আমি কখনোই প্রাধান্য দিব না। হয়ত আমি এর মাধ্যমে সেই দ্বীনের ওপরই অটল থাকব যে দীনে এলাহীতে আমল কবুল করা হয়, ভালকাজের প্রতিদান দেয়া হয় ও গোনাহের কাজেরও বদলা দেয়া হয়। তবে যাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন; তার বিষয় ভিন্ন।

মুআবিয়ার কথা শুনে মিসওয়্যার কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকার পর বললেন, আপনি আমাকে বিতর্কে পরাজিত করে ফেলেছেন। এরপর তিনি মুআবিয়ার জন্য দুআ করে মুআবিয়ার দরবার থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে মিসওয়্যাক যখনই মুআবিয়ার আলোচনা করতেন তখন তাঁর জন্য দুআ করতেন। মন্দভাবে আর কখনোই তাঁকে মুআবিয়ার নাম নিতে শোনা যায়নি। এটা কেন সম্ভব হয়েছিল? কারণ হযরত মুআবিয়া সঙ্কোচ ছেড়ে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কতইনা ভাল হত যদি আত্মার সংশোধনকল্পে মুআবিয়ার মতো সৎসাহস আমাদেরও থাকত!

রোযাদার ভাই ও বোনেরা!

এ বরকতময় মাসে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যে কাজটি করা উচিত তা হচ্ছে, মানুষের মাঝে সংশোধনী আনা ও তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকা। তাঁর পথে আহ্বান করা। এ মাস এ কাজের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কারণ অন্যান্য মাসের তুলনায় মানুষ অনেক বেশি ইবাদত ও ভালকাজের দিকে মনোযোগী হয়। অনেকেই সারা বছর যে গোনাহের কাজগুলো করত; এ মাসে সেসব গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে। এই মাসে মানুষের অন্তর আল্লাহর দিকে বেশি মনোযোগী হয়। তাছাড়া এ মাসে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

কত পিতা সন্তানের অবাধ্যতার অভিযোগ নিয়ে আসে। কত যুবক তার বন্ধুর হিদায়াত কামনা করে। কত স্ত্রী তার স্বামীর তওবা ও গোনাহ থেকে ফিরে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে, কিন্তু পরিবর্তনের সুযোগগুলোর আমরা সদ্ব্যবহার করি না। রমযান হচ্ছে পরিবর্তনের সুবর্ণ সুযোগ।

এ মহিমান্বিত মাসে মানুষের কলব পরিবর্তিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আসে। সুতরাং ঈমানের অস্ত্রের মাধ্যমে কেন আমরা সেগুলোকে শিকার করব না? কেন আমরা রোযার মাসে এ সুযোগগুলোকে কাজে লাগাব না?

রমযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য দ্বীনের দাওয়াত

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান ও সংশোধনের প্রতি ডাকা কেন আমাদের এ মহান মাসের লক্ষ্য হয় না? অথচ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দু'একজন মানুষও তোমার মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাওয়া তোমার জন্য লাল বর্ণের প্রাণীর চেয়েও অধিক উত্তম।'

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান ও যমীনবাসী, এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও সমুদ্রের মাছও তালীমদাতাদের কল্যাণের জন্য দুআ ও মাগফেরাত কামনা করতে থাকে।'

দ্বীনের দায়ী ও প্রচারক কত ভাবেই মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে পারে! কত কথাই বলতে পারে! কে জানে কোন কথা কোন শ্রোতার হিদায়াতের উপলক্ষ্য হয়ে যায়! কোনো বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কথা বলে, অথচ তার কথার প্রতি কারো কোনো মনোযোগ থাকে না, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন অবধি ঐ বান্দার জন্য সন্তুষ্টির ফয়সালা করে রাখেন।

আমরা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের কার্যক্রম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে জানি। এখন আমাদের প্রয়োজন, দাওয়াতের সেই দায়িত্ব ও পরিকল্পনাকে নিজের কাঁধে উঠানো এবং সেটাকে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, মানুষের হিদায়াতের জন্য বিভিন্নভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়া। তাদের গল্প-আসরে গিয়ে বসে পড়া। তাদের ঈমান বৃদ্ধির স্বার্থে, তাদেরকে তাদের রবের খাতি গোলাম বানানোর স্বার্থে দাওয়াতের কাজে সময় লাগানো।

হযরত কাযী ওয়াকী রহ. প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর সূর্য পূর্নোজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে বসতেন। এরপর বাড়ি ফিরে সামান্য সময় ঘুমাতে। যোহরের নামায আদায়ের পর গ্রামবাসীরা পানি আনয়নের উদ্দেশ্যে যে পথে বের হত, তিনিও সে পথে চলে যেতেন। যখন লোকদেরকে উট ছেড়ে অবসর বসে থাকতে দেখতেন তখন তিনি তাদের কাছে গিয়ে বসতেন। তারা যেন অন্তত নামায আদায় করতে পারে; সে তাদের কাছে বসে বসে তাদের সেই পরিমাণ কুরআন শিক্ষা দিতেন। রোদ-বৃষ্টি কোনো অবস্থাতেই তাঁর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না। আসরের আযান পর্যন্ত এ নিয়মানুবর্তিতা ধরে রাখতেন। আসরের আযান হলে তিনি মসজিদে চলে যেতেন।

কাযী ওয়াকী কেবল একক ব্যক্তি ছিলেন না যিনি দ্বীনের জন্য এমন রোদ্রতাপে পুড়তেন এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় নিজেকে বিলীন করে দিতেন, বরং যুগে যুগে উম্মতের মাঝে এমন ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ব্যক্তি সব সময় ছিল।

খায়ান শহরের কয়েকজন শায়েখ আমাকে বিশিষ্ট দায়ী আব্দুল্লাহ আল কারায়ী সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি কখনোই মানুষকে শিক্ষা দানের এবং আল্লাহর প্রতি আহবানের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না।

একদিন তিনি একটি কুয়ার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেখানে রাখালরা তাদের পশুর পালকে পানি পান করার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন রাখাল তার পালা আসার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখেই শায়েখের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি কুয়ার পাশে একটি ছাতা তৈরি করলেন। রাখালরা আসার অপেক্ষায় তিনি সেই কুয়ার পাশে গিয়ে বসে থাকলেন। আর নিজের সামনে একটি খেজুরের পাত্র রাখলেন। যখনই কোনো রাখালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেন, তাকে কাছে ডাকতেন। বলতেন, ভাইসাব! আসুন! খেজুর খান আর সূরা ফাতিহা মুখস্থ করে নিন। ফলে রাখালরা তাদের প্রাণীকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখত আর শায়েখের সামনে এসে বসে থাকত। তারা খেজুর খেতে থাকত আর শায়েখ তাদেরকে সূরা ফাতিহা শেখাতে থাকতেন। এভাবে তার প্রাণীকে পান করানোর পালা আসার পূর্বেই তার সূরা ফাতিহা মুখস্থ হয়ে যেত। এভাবে তিনি শত শত সাধারণ অশিক্ষিত মানুষকে সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিয়েছেন।

কখনো কখনো কারো হিদায়াত বা নাফরমানী থেকে ফিরে আসা কেবল কোনো একটি শিক্ষণীয় কথা বা সোজাসাপ্টা দাওয়াতের মাধ্যমেও হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে আমি আমার একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। দু'বছর আগে একবার আমাকে রমযানের এক রাতে কোনো এক টিভি চ্যানেলে লাইভ প্রোগ্রামের জন্য দাওয়াত দেয়া হল। প্রোগ্রামটি ছিল রমযানে ইবাদত সংক্রান্ত। প্রোগ্রামটি ধারণ করা হয়েছিল মক্কার এক হোটেলের এমন একটি সুসজ্জিত অভিজাত কামরায় যার জানালা দিয়ে অদূরে মসজিদে হারামের দৃশ্য সরাসরি দেখা যায়। আমরা আলোচনা করছিলাম রমযান সম্পর্কে আর দর্শকরা আমাদের পেছনে একটি খোলা জানালায় মসজিদে হারামে উমরা ও তওয়াফরত মানুষদের সরাসরি দেখতে পাচ্ছিলেন। দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত হৃদয়ছোয়া। সেদিনেও কথাবার্তাও ছিল মর্মস্পর্শী। এমনকি প্রোগ্রামের শুরু থেকে যারা ছিলেন আলোচনা তাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কেউ কেউ আলোচনার মাঝেই কেঁদে উঠেছিলেন। পরিবেশ ছিল ঈমানী পরিবেশ। অনুষ্ঠানটি পূর্ণ এক ঘণ্টা চলমান ছিল। সালামের মাধ্যমে মজলিসের পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রোগ্রামটি শেষ হলে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং ধন্যবাদ দিতে ক্যামেরাম্যান এগিয়ে এসে মুসাহাফা করতে একহাত এগিয়ে দিলেন। তার অন্য হাতে ছিল সিগারেট। আমি শক্তভাবে তার এগিয়ে দেয়া হাতটি ধরলাম। বললাম, এমন একটি দীনি অনুষ্ঠানে আপনার কোনো না কোনোভাবে অংশগ্রহণ করায় আমিও আপনার শোকরিয়া আদায় করছি, কিন্তু আপনি যদি কিছু মনে না করেন ও সুযোগ দেন তাহলে আপনাকে আমার কিছু বলার ছিল। আশা করি, আপনি অনুমতি দিবেন। তিনি বললেন, কেন নয়? অবশ্যই। বলুন বলুন, কী বলতে চান?

বললাম, ধূমপান ও সিগারেল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম..। কথা শেষ করার আগেই তিনি আমায় থামিয়ে দিলেন। বললেন, আমাকে এ বিষয়ে নসীহত করবেন না। শায়েখ! এতে কোনো উপকার হবে না।

বললাম, ঠিক আছে, ভাল। তবু আমার কথা তো শুনুন। আপনি তো জানেন ধূমপান করা হারাম এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন....। তিনি আবার আমায় থামিয়ে দিলেন।

বললেন, শায়েখ! আপনি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। জীবনের চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল। তবু ধূমপান করছি। ধূমপান আমার রগ-রেশায় মিশে গেছে। তাছাড়া ওতে কোনো উপকার নেই কথাটি সঠিক নয়। আপনি ছাড়া অন্যরাও কিন্তু বুঝমান। আমিও নিজের ভালমন্দ বুঝি।

বললাম, তাহলে তাতে কী উপকার নিহিত? তিনি আমার কথায় বিরক্ত হলেন। বললেন, ছাড়ুন তো আমাকে। বলে হাত টান দিলেন। কিন্তু আমি তাকে শক্ত করে ধরে রইলাম। বললাম, আসুন! আমার সাথে। আসুন! কাবার দৃশ্য দেখি। তাকে নিয়ে হারাম শরীফ দেখা যায় এমন একটি বেলকনীতে গিয়ে দাঁড়িলাম। তখন কাবার চারপাশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি যেন লোকে লোকারণ্য। কেউ রুকু বা সিজদারত। কেউ উমরা বা ত্রন্দনরত। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওদেরকে দেখতে পাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, দেখতে পারছি। বললাম, দেখুন! এরা কত দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করেছে। সাদা-কালো, আরব-অনারব, ধনী-গরীব সবাই আল্লাহকে ডাকছে, যেন তিনি তাদের কবুল করেন ও ক্ষমা করেন।

তিনি বললেন, হুম! আপনি ঠিকই বলেছেন।

আমি বললাম, আপনি কি চান না আল্লাহ তাআলা তাদের যা দিয়েছেন তা আপনাকেও দান করুন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ঠিক আছে, হাত উঠান। আমি আপনার জন্য দুআ করছি। আপনি আমার সাথে দুআয় আমীন বলবেন।

এরপর আমি হাত উঠিলাম। দুআ করলাম, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন, আমীন। আমি দুআ করলাম, হে আল্লাহ! তার মর্যাদাকে সম্মান করুন এবং তাকে জান্নাতে তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত করুন। তিনি বললেন, আমীন।

এভাবে আমি দুআ করতে থাকলাম। এক সময় তার আবেগ উথলে ওঠল। হৃদয় গলে গেল। সে কাঁদতে আরম্ভ করল আর বারবার আমীন আমীন বলতে লাগল। দুআর শেষে আমি বললাম, হে আল্লাহ! ও যদি ধূমপান ছেড়ে দেয় তাহলে এ দুআকে আপনি কবুল করুন। আর যদি না ছাড়ে

তাহলে তাকে এ দু'আ থেকে বঞ্চিত করুন। তা শুনে তিনি আরো বড় গলায় কেঁদে উঠলেন। এক পর্যায়ে দুই হাতে চেহারা ঢেকে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর কয়েক মাস অতিক্রম হল। আবার আরেকটি সাক্ষাতকারে জন্য আমাকে সেই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আগের জায়গাতেই ডাকা হল। ঢুকতেই সেখানে এক দীনদার ব্যক্তি আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। উষ্ণতার সাথে আমাকে সালাম দিল। আমার মাথায় চুমু খেল এবং হাতে চুমু খেতে আমার হাত টানতে লাগল। তাকে কোনো কারণে খুব প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রভাবান্বিত মনে হচ্ছিল।

আমি তাকে বললাম, আপনার এ সম্মান ও কোমল আচরণের জন্য শোকরিয়া। আপনার মহব্বতের আমি যথার্থ মূল্যায়ন করি, কিন্তু আমায় ক্ষমা করবেন! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

তিনি বললেন, আপনার কি মনে আছে এক ক্যামেরাম্যানকে দু'বছর আগে আপনি ধূমপান পরিহার করতে উপদেশ দিয়েছিলেন? বললাম, হ্যাঁ। মনে আছে।

তিনি বললেন, শায়েখ! আমিই সেই ব্যক্তি। আল্লাহর কসম! সেই থেকে আর কখনো আমি ধূমপান করিনি।

আমার রোযাদার ভাই-বোনেরা! রোযা হচ্ছে ঈমানী জাগরণের এক মহতি সুযোগ। তাই এ সুযোগকে সর্বোচ্চ কাজে লাগান। এ সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকুন।

রমযান সচ্চরিত্র অনুশীলনের অফুরন্ত সম্ভবনা

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অসৎ কাজ ছাড়তে পারল না, তার পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'রোযা হচ্ছে ঢাল। অতএব তোমাদের কারো

যখন রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে। অশ্লীল কাজ না করে এবং মূর্থতা অবলম্বন না করে। কেউ তাকে গালি দিলে সে যেন বলে দেয়, নিশ্চয়ই আমি রোযাদার।’

কাজেই সওয়াবের প্রত্যাশী রোযাদারকে যখন কেউ কষ্ট দিবে বা গালি দিবে তখন সে রাগ প্রদর্শন করবে না, বরং বলে দিবে, আমি তো রোযাদার। মন্দের মোকাবেলা সে মন্দ আচরণ দ্বারা করবে না। সে অস্থির হবে না। কারণ সে রোযাদার। সে যেন অসদাচারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলে দেয় যে, তোমার যা খুশী করতে পার। আমি তো রোযার মাধ্যমে আমার রবের সাথে এই ওয়াদায় উপনীত হয়েছি যে, আমি আমার যবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সংযত রাখব। সুতরাং কিভাবে আমি আমার রবের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি?! আমি রোযাদার। কাজেই বিবাদ করার বা মন্দ কথা বলার আমার সময় নেই।

আমাদের পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন কেবল রমযান মাস নয়, বরং রমযান ছাড়াও সারা বছর তাদের যবানকে হিফাজত করতেন। রাগকে হজ্জম করতেন। চরিত্রকে সুন্দর করতেন। তো একবার ভাবুন, রমযানে তাদের অবস্থা কেমন হত?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. যখনই রাস্তায় বের হতেন, সাথে সব সময় তাঁর একান্ত ছাত্র ইকরামা ও আরো কিছু ছাত্ররা থাকতেন। একবার তিনি ছাত্র ও ভক্ত সমেত পথ চলছেন। চলতি পথে এক লোক তাঁর গতি রোধ করল। তাঁকে গালমন্দ ও বিভিন্ন দোষে দোষারোপ করল। ইবনে আব্বাস নির্বিকার; আর লোকটি তাঁকে গালাগাল করেই চলছে। যখন লোকটির ক্রোধ কিছুটা হ্রাস পেল তখন ইবনে আব্বাস ইকরামাকে বললেন, ‘দেখ! লোকটির কোনো প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করে দাও।’ এই বলে তিনি সামনে পা বাড়ালেন।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয রহ. একবার তাঁর কিছু প্রহরীদের নিয়ে মসজিদে গেলেন। ততক্ষণে মসজিদের প্রদীপগুলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে আর কিছু মানুষ মসজিদেই শোয়ে ঘুমাচ্ছে। তিনি ঘুমন্ত ব্যক্তিদের মাঝ দিয়েই খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলতে ফেলতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পায়ের সাথে এক ঘুমন্ত ব্যক্তির পা লেগে গেল। ঘুমন্ত ব্যক্তি রাগত অবস্থায় ঘুম ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যামানার খলীফা

ওমরকে চিৎকার করে বলল, তুমি একটা গাঁধা। দেখে পথ চলতে পার না? ওমর বিন আব্দুল আযিয অত্যন্ত শান্ত ও বিনম্রভাবে তার জবাব দিলেন, ‘ভাই! তোমার ধারণা ভুল। আমি গাঁধা নই, আমি ওমর বিন আব্দুল আযিয।’ লোকটির কথায় প্রহরীরা উত্তেজিত হয়ে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইল, কিন্তু ওমর তাদের বারণ করলেন। বললেন, সে তো তেমন কিছু করেনি যে তাকে শাস্তি দিতে হবে। সে কেবল আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি গাঁধা কিনা। আমিও তার জবাব দিয়ে দিয়েছি যে, আমি ওমর, গাঁধা নই। ব্যস, ব্যাপার এখানেই শেষ। তাকে শাস্তি দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এসব হচ্ছে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা। বীর সে নয়, যে দ্রুত শত্রুকে ধরাশায়ী করতে পারে। প্রকৃত বীর তো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সাহসী তো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে শরীয়তের শিষ্টাচার ও নৈতিকতার গুণে গুণান্বিত করতে পারে।

রোযার শিক্ষা আপনাকে এ পথে পরিচালিত করবে। আপনাকে অন্যকে ক্ষমা করতে অনুপ্রাণিত করবে। তাই রোযা থাকাবস্থায় কোনো রাগ নেই। কোনো গালাগাল, দোষারোপ বা অশ্লীল কথা বা কাজ চলবে না। অধিকন্তু কেউ গালি দিলে তাকে উল্টো বলতে হবে, আমি তো রোযাদার।

বিশিষ্ট মুফাসফির ইকরামাকে ‘ইয়াহয়া ইবনে যাকারিয়া আ.’ সম্পর্কে বর্ণিত কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ.

“যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সংকর্মশীল নবী হবেন।” [সূরা আল ইমরান : ৩৯]

যে আয়াতে হযরত ইয়াহয়াকে **حُصُور** বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, **حُصُور** হচ্ছে ঐ মহান ব্যক্তি রাগ যার ওপর জয়ী হতে পারে না।

এমন অনুপম ভদ্রতা ও শালীনতাই সভ্যজনের স্বভাব। লক্ষ্য করুন হযরত ইউসুফ আ.এর প্রতি! তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বিক্রি করে দিয়েছিল। আপন পিতাকে তারা অস্থির ও পেরেশান করেছিল, কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানে হযরত ইউসুফের হাতে তাদের কর্তৃত্ব এল। অভাবের তাড়নায় ভাইয়েরা ইউসুফের দরবারে এসে বলল, আমাদের প্রতি দান-সদকা করুন। সেদিন ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের কী জবাব দিয়েছিলেন? পূর্বের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে শয়তানের নাককে পদদলিত করে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বলেছিলেন,

قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

অর্থাৎ তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি তো সবচেয়ে বেশি দয়ালু। [সূরা ইউসুফ : ৯২]

রোযা বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

আমি আমার আলোচনার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। শেষ করার আগে আমি রোযা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথম মাসআলা

রোযার নিয়তে রোযাভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকার নাম হল রোযা। একান্ত ওয়র ছাড়া যে ব্যক্তি রমযানের কোনো রোযা ভেঙ্গে ফেলে সে মারাত্মক কবীরা গোনাহ করল।

সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একটি স্বপ্ন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে অবগত করার ক্ষেত্রে বলেছিলেন, ‘এরপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরো অগ্রসর হলেন। সেখানে আমরা এমন একদল লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম যাদের কানের দুই প্রান্ত ছিল ঝুলন্ত, আর তাদের চোয়াল চিড়ে ফেলা হয়েছে, যা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি জবাব দিলেন, এরা ঐ সকল লোক যারা ইফতারের পূর্বেই রোযা ভেঙ্গে ফেলত।’

প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বালগ, শারিরীক ভাবে সক্ষম, হায়েয-নিফাস ও মানসিক বিকারহস্ততা থেকে মুক্ত মুকীম নরনারীর ওপর রোযা রাখা ফরয। রোযা রাখতে সক্ষম নাবালগ বাচ্চাদেরকে রোযা রাখতে বলা মুস্তাহাব। সহীহ বুখারীতে রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়ায রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ‘আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) আমাদের বাচ্চাদেরকে রোযা রাখাতাম এবং তাদের জন্য পশমের খেলনা কিনে দিতাম। খানার কারণে তাদের কেউ কাঁদলে হাতে খেলনা তুলে দিতাম। এভাবে ইফতারের সময় পর্যন্ত পার করতাম।’

পাগলের ওপর রোযা ফরয নয়। তবে কারো পাগলামী যদি অস্থায়ী হয় যেমন কিছু সময় সুস্থ থাকে আর কিছু সময় পাগল থাকে তাহলে সুস্থকালীন রোযা রাখা আবশ্যিক। পাগলামী থাকাকালীন নয়। সুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা শুরু করা পর দিনের মধ্যবর্তী সময়ে হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে এতে তার রোযা বাতিল হবে না। যেমন কেউ অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে বেহুশ হয়ে গেলে তার ঐ দিনের রোযা বাতিল হয় না। কারণ রোযার নিয়ত করাকালীন সুস্থ ছিল। মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হুকুমও তাই।

ফরয রোযার জন্য রাত থেকে রোযার নিয়ত থাকা জরুরী। অন্তত সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার এক মুহূর্ত আগে হলেও রোযার নিয়ত করা জরুরী। কারণ সুনানে আবু দাউদে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ‘যে ব্যক্তি রাত থেকে রোযা করে না তার কোনো রোযা নেই।’ (হানাফী মাযহাব মতে রোযার দিন সূর্য ঢলে পড়ার আগে ফরয রোযার নিয়ত করার অবকাশ রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবি সালামা ইবনুল আকওয়া সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে এর সমর্থন

পাওয়া যায়। বিশেষত ফরয রোযার ক্ষেত্রে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযিয রাযি.এর অবস্থানও এমনি ছিল-অনুবাদক)

তবে সাধারণ নফল রোযার জন্য রাত থেকে নিয়ত করা জরুরী নয়। কারণ ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। বললেন, তোমাদের কাছে (খাবার মতো) কিছু আছে কি? আমরা বললাম, নেই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আমি আজ রোযা।

তবে নির্দিষ্ট নফল রোযা যেমন আরাফা বা আশুরার রোযা এসব ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক রাত থেকেই নিয়ত করা বাঞ্ছনীয়। যেন পরিপূর্ণ সওয়াব অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় মাসআলা

কিছু রোযা রয়েছে যা লাগাতার রাখতে হয়। যেমন রমযানের ফরয রোযা, ভুলবশত কাউকে হত্যার কাফফারার রোযা, যিহার বা রমযানের কাফফারার রোযা বা লাগাতার রোযার মানতকারীর রোযা ইত্যাদি।

আবার কিছু রোযা রয়েছে যা লাগাতার রাখা জরুরী নয়। যেমন রমযানের কাযা রোযা, হজে হাদী পাঠাতে অক্ষম ব্যক্তির পালনীয় দশদিন রোযা, কসমের কাফফারা, ইহরাম পরিপন্থী কাজ করায় ফিদয়ার রোযা, সাধারণ মানতের রোযা যাতে লাগাতার রোযার মানত করা হয়নি। তদ্রূপ নফল রোযা যেমন আশুরা, আরাফা, সোমবার, বৃহস্পতিবার ইত্যাদি দিনের রোযা। এসব রোযা ফরয রোযার ঘাটতিগুলো পূরণ করে থাকে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু জুমআর দিনে রোযা রাখতে বারণ করেছেন। সুতরাং কেউ জুমআর দিন রোযা রাখতে চাইলে সে যেন আগে বা পরে একদিন মিলিয়ে রোযা রাখে। এছাড়া দুই ঈদের দিন, এবং তাকবীরে তাশরীক পড়ার দিনগুলো তথা জিলহজ্জের এগার, বার ও তের তারিখে রোযা রাখা হারাম। তবে যার হাদী নেই সে মিনায় এ দিনগুলোতেও রোযা রাখতে পারবে।

তৃতীয় মাসআলা

মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। চাই সে রোযা রাখতে সক্ষম থাকুক বা অক্ষম থাকুক। রোযা রাখতে তার কষ্ট হোক বা না হোক। তবে তার রোযা ছাড়তে সফরের উদ্দেশ্যে নিজ শহরের আবাদী অতিক্রম করা জরুরী। মুসাফির যদি রোযা না রাখাবস্থায় দিনের বেলা নিজ এলাকায় পৌঁছে সেক্ষেত্রে দিনের অবশিষ্ট সময় তার পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা জরুরী কিনা; এ নিয়ে ফকীহগণের মতভিন্নতা রয়েছে। তবে রোযার সম্মানার্থে অবশিষ্ট দিন রোযাদারদের মতো কাটানোর মাঝেই সতর্কতা।

আর যে রোগের কারণে রোযা রাখা সম্ভব নয় কিংবা রোযা রাখলে রোগ প্রচণ্ড আকার ধারণের শঙ্কা থাকে এমন রোগীর জন্য রোযা না রাখার অবকাশ রয়েছে। তবে সাধারণ কষ্টের শঙ্কা বা কেবলই অনুমানের কারণে রোযা ছাড়া জায়েয হবে না। তদ্রূপ পরীক্ষা ইত্যাদির অযুহাতেও রোযার প্রতি কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন জায়েয হবে না।

আর যে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার আশা আছে, সে অপেক্ষা করবে। সুস্থ হলে বিগত সময়ের ছুটে যাওয়া রোযার কায্য করবে। কিন্তু এমন দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত যার সুস্থতার কোনোই আশা নেই, তদ্রূপ অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি যে বার্ধ্যাক্যের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তারা প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। তবে মাস শেষে পূর্ণ মাসের খাবার এক সাথে ত্রিশজন মিসকীনকে খাওয়ানোও জায়েয আছে। আর অসুস্থ ব্যক্তি পরবর্তীতে সুস্থ হলে এবং কায্য আদায়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাতে অলসতা করতে করতে অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর কোনো নিকটাত্মীয় তা কায্য করে দিতে পারে। (অধিকাংশ ফকীহের মতানুসারে রোযায় প্রতিনিধিত্ব কার্যকর হয় না। আত্মীয়রা চাইলে ঐ ব্যক্তির ফিদিয়া আদায় করতে পারে— অনুবাদক)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ‘যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল, অথচ তার দায়িত্বে রোযা রয়ে গেছে তাহলে তার অলী তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে।’ অথবা মৃতের সম্পদ থেকে প্রতি রোযার ফিদিয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।

অতিবৃদ্ধের যদি জ্ঞান থাকে, কিন্তু তিনি রোযা রাখতে অক্ষম, তাহলে তিনি প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবেন। আর তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেলে এবং বার্ষিক্য জনিত বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে তাহলে তার ওপর রোযা রাখাও ওয়াজিব নয়। তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে খানা খাওয়ানোও জরুরী নয়। তবে কখনো বুদ্ধিসম্পন্ন ও কখনো আবোল তাবোল বকলে বুদ্ধি থাকাকালীন রোযা রাখা ওয়াজিব। বুদ্ধিলোপকালীন সময়ের রোযা রাখা ওয়াজিব নয়।

চতুর্থ মাসআলা

সুবহে সাদিক শুরু হলে তাৎক্ষণিক রোযাদারের জন্য যাবতীয় বর্জনীয় বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক। সতর্কতামূলক ভাবে আযানের দশ মিনিট বা এমন পূর্ব থেকেই ওসব বর্জন করার রীতি একটি বিদআতী প্রচলন। এসব রীতি রেওয়াজের পরিবর্তে আযান তথা সুবহে সাদিকের সময় থেকেই ওসব বর্জন করা যথেষ্ট। আর সূর্যাস্ত হলে ইফতারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গবে। দ্রুত ইফতার করা সুন্নত।

মুস্তাদরাকে হাকেম সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ঢোক পানি পান করে হলেও ইফতার করা ছাড়া মাগরিবের নামায পড়তেন না।’ ইফতার করার মতো কোনো খাবার না পেলে সেক্ষেত্রে মনে মনে ইফতারের নিয়ত করবে।

যে ব্যক্তি কোনো ওয়ের কারণে রোযা ছেড়ে দিবে এবং তার রোযা না রাখার কারণটিও প্রত্যক্ষ। যেমন সে এমন অসুস্থ যে তাকে দেখলে যে কেউ বুঝে যে সে অসুস্থ, তাহলে তার প্রকাশ্যে পানাহার করতে কোনো বাধা নেই। পক্ষান্তরে যার রোযা না রাখার কারণটি পরোক্ষ তাহলে তার জন্য উত্তম হচ্ছে, প্রকাশ্যে পানাহার থেকে বিরত থাকা।

পঞ্চম মাসআলা

রোযা ভঙ্গকারী বস্তুগুলো সাত শ্রেণীর।

১. খাওয়া বা পান করা যা একটি স্বতসিদ্ধ বিষয়। এছাড়া কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। যেমন ঔষধ বা কোনো

বড়ি সেবন করা ইত্যাদি বা খাদ্য স্যালাইন বা শরীরে রক্ত পুষ করা হলে এসবও রোযা ভেঙ্গে দেয়। (রক্ত নিলে অধিকাংশের মতে রোযা ভাঙ্গে না। আর স্যালাইন বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে- অনুবাদক)

যেসব স্যালাইন খাদ্য স্যালাইন নয়, কিন্তু ঔষধ হিসেবে তা সেবন করা হয়। যেমন বেনসিলিন, ইনসুলিন বা টিকাদান। এসব দ্বারা রোযা ভাঙ্গে না। চাই তা রগের মাঝে দেয়া হোক বা মাংসপেশীতে। তবে উত্তম হচ্ছে, এসব ঔষধও রাতে ব্যবহার করা। রোযার দিনে এসব ব্যবহার কাম্য নয়।

তবে কিডনী ওয়াস (ডায়ালাইসিস) করতে গিয়ে তা শোধনের জন্য যে রক্ত নিষ্কাশন করে রসায়নিক ও খাদ্য সংক্রান্ত অন্যান্য পদার্থ যুক্ত করে পুনরায় সেই রক্ত দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়; এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

তবে চোখ বা কানের ড্রপ, দাঁত উঠানো. আঘাতের স্থানে মলম ব্যবহারের কাণে রোযা ভাঙ্গবে না। হাপানির স্প্রে করার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে। 'লাজনায়ে দায়েমা' এর ফতোয়ায় এমনটিই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি মিসওয়াক বা ব্রাশ করতে গিয়ে মুখের ভিতর কোনো কিছু প্রবেশ না করলে রোযা ভাঙ্গবে না। দৈহিক শোষণের মাধ্যমে খুব সূক্ষ্মভাবে চামড়া দিয়ে কিছু দেহে প্রবেশ করলে তাতেও রোযা ভাঙ্গবে না।

রোযাদার যদি রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেলে তাহলে সে তার রোযাকে পূর্ণ করবে। কারণ এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন। কাজেই তার এ রোযার কাযা বা কাফফারা কোনোটিই আদায় করতে হবে না। তবে এমন ব্যক্তিকে কেউ দেখলে স্মরণ করিয়ে দেয়া জরুরী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থাৎ তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর আর গোনাহ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'আমি যদি ভুল করি, আমাকে তোমরা স্মরণ করিয়ে দিয়ো।'

কাউকে বাঁচানোর জন্য রোযা ভাঙ্গার প্রয়োজন হলে যেমন পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে, আগুনে পতিত ব্যক্তিকে বাঁচাতে রোযা ভাঙ্গার প্রয়োজন হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে এবং কাযা আদায় করবে।

২. সহবাস ও বা রোযাদারের কোনো কর্মের কারণে উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হওয়া। যে ব্যক্তির ওপর রোযা রাখা ওয়াজিব সে যদি রমযানের দিনের বেলায় রোযা রাখাবস্থায় সহবাস করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তার জন্য জরুরী হচ্ছে, তওবা করা ও দিনের অবশিষ্ট সময় পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা এবং পরবর্তীতে সেই রোযার কাযা ও কাফফারা আদায় করা। এই হুকুম স্ত্রীর সাথে বৈধ সহবাস, যিনা, সমকামিতা ও প্রাণীর সাথে এরূপ কর্ম, সব ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। (অধিকাংশ ফকীহের মতে নারী-পুরুষের সহবাসের ক্ষেত্রেই কেবল বিধানটি প্রযোজ্য-অনুবাদক)

‘লাজনায়ে দায়েম’ এর ফতোয়া হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি রমযানের দিনগুলোতে বহুবার সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে একদিনের অপরাধ হিসেবে অনুসারে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব।

গোসল ওয়াজিব অবস্থায় কারো ভোর হলে রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সূর্যোদয়ের পরও ফরয গোসল বিলম্বিত করা যায়। তবে নামাযের সময় হলে দ্রুত গোসল করা ওয়াজিব। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে রোযা সহীহ হয়ে যাবে। তবে স্বেচ্ছায় হস্তমৈথুন ইত্যাদির দ্বারা বীর্যপাত ঘটালে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

৩. ইচ্ছাকৃত বমি করা। মুখে আগুল ঢুকিয়ে বা পেট মুচড়িয়ে বা অন্য কোনো পন্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ মুখভরে বমি করলে তার ওপর কাযা করা ওয়াজিব। তবে অনিচ্ছায় বমি হলে রোযা ভাঙ্গবে না। কফ গলায় থাকাবস্থায় গিলে ফেললে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে মুখের বাইরে চলে আসার পর গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
৪. সিঙ্গা লাগানো। (বিশুদ্ধ মতানুসারে রোযাবস্থায় সিঙ্গা লাগানের ফলে রোযা ভাঙ্গে না-অনুবাদক) রোযাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি রক্ত বের করা যেমনটি রক্তদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; তদ্রূপ অঙ্গ

- রক্ত টেনে আনা বা অনিচ্ছায় নাক থেকে বা অন্য কোনো ক্ষতস্থান থেকে বেশি রক্ত বেরিয়ে যাওয়ায় রোয়ার কোনো ক্ষতি হবে না।
৫. হায়েয-নিফাস। এটা মহিলাদের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি। হায়েয-নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের রক্ত যদি রাতের বেলা বন্ধ হয় আর সে রোয়ার নিয়ত করে, এরপর তার গোসলের পূর্বেই সূর্যোদয় হয় তাহলেও রোয়ার কোনো সমস্যা হবে না। মহিলাদের জন্য রক্ত বন্ধের জন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ না করাই উত্তম। তবে এমন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে বাস্তবেই যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং সে রোয়া রাখে, তাহলে রোয়ার সওয়াব পাবে। নিফাসগ্রস্ত মহিলার রক্ত চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বন্ধ হলে সে রোয়া রাখবে ও গোসল করে নামায আদায় করবে।
৬. গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলা অসুস্থ ব্যক্তির মতো। নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের রোয়া না রাখার অবকাশ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাযা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুসাফির থেকে রোয়া ও আংশিক নামায বিলোপ করেছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী থেকে রোয়াকে বিলোপ করেছেন।’ ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।
৭. রোয়া অবস্থায়ও মিসওয়াক করা সুন্নত। রোয়াবস্থায় আতর বা সুঘ্রাণযুক্ত তেল, গোলাপজল বা দুর্গন্ধময় কোনো বস্তুর ঘ্রাণ নেয়া বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করাতে রোয়া ভাঙ্গে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ধুয়া মুখের ভিতর নেয়ার কারণে রোয়া ভেঙ্গে যায়।

ষষ্ঠ মাসআলা

রোয়ার অন্যতম আদব হচ্ছে, সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে আত্মহীন হওয়া এবং শেষ সময় পর্যন্ত সেহরী খাওয়া বিলম্বিত করা। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমরা সেহরী খাও। কারণ নিশ্চই সেহরীতে বরকত রয়েছে।’

দ্রুত ইফতার করার ব্যাপারে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ যতক্ষণ দ্রুত ইফতার করবে তারা কল্যাণ বঞ্চিত হবে না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি পাকা খেজুর খেয়ে ইফতার করা ছাড়া নামায আদায় করতেন না। পাকা খেজুর না থাকলে কাঁচা খেজুর খেতেন। তাও না থাকলে অন্তত কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।

কাজেই আমার ভাই-বোনেরা!

আসুন! আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে সওয়াবের প্রত্যাশায় রযমানের রোযা রাখার ও তারাবীতে শরীক হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমাদের সিয়াম সাধনাকে তিনি কবুল করেন। এর দ্রুতি ও অপরাধগুলো ক্ষমা করেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত সাফল্য আমাদের দান করেন। আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতা ও সকল মুসলিম নরনারীকে তিনি ক্ষমা করেন। তিনি সুমহান, দয়ালু, সর্বজ্ঞাত। সাল্লাল্লাহু আলা নাবিইয়িনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহী ও সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।

বাইতুল্লাহর মুসাফিরের পাথেয়

الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيت الحرام. ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. أحمدته سبحانه على الرخاء والنعماء. وأشكره في السراء والضراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شرع الشرائع وأحكام الأحكام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

বাইতুল্লাহর আশেক

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আলোচনার শুরুতেই দূরদেশের মানুষের বাইতুল্লাহর প্রেমের একটি বাস্তব ঘটনা শোনাই। একজন মহিলা, পাকিস্তানের অধিবাসী। তিনি ও তার বৃদ্ধ স্বামী হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। একবার তিনি তার স্বামীর উপর হেলান দিচ্ছিলেন। আরেকবার স্বামী তার উপর হেলান দিচ্ছিলেন। মাটিতে পা হিচড়াতে হিচড়াতে তারা সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সফরের ক্লান্তি তাদের দুর্বল করে দিয়েছিল। কষ্ট ও পরিশ্রম তাদের বিপদগ্রস্ত করে তুলেছিল। তারা বিমানের টিকেট ক্রয়ের জন্য এবং মক্কা মুকাররমায় সফরের জন্য তাদের মালিকানাধীন যাবতীয় সম্পদ জমা করলেন। তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে এক সময় বাস্তবেই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের অনুমতি পেয়ে গেলেন। তারা জিদা বিমানবন্দরে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছার পরও তারা চরম অস্থিরতা ও পেরেশানী নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। যার সাথেই সাক্ষাত হচ্ছিল তাকেই প্রশ্ন করছিলেন, এটা কি মক্কা? তাদের বলা হচ্ছিল, না। এটা জিদা। অচিরেই বাস বা ট্রেন তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবে।

তারা খুব তাড়াহুড়া করছিল। দ্রুত মক্কায় পৌঁছার জন্য তারা একটি থাইভেট গাড়ি ভাড়া করল। তারা শঙ্কিত ছিল; না জানি কাবা ঘরে পৌঁছার পূর্বেই তাদের মৃত্যু এসে যায়। গাড়িতে তারা অনবরত কান্না ও দুআ করছিল। গাড়ির চালক তাদেরকে ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, কোনো হোটেলের সামনে গাড়ি থামাবে কিনা, কিন্তু তারা চালকের কথা বুঝতে পারল না।

চালক প্রথমে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে, তারপর একটি ছোট খাবারের হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। তাদেরকে হাতের ইশারায় গাড়ি থেকে নেমে কিছু খাবার কিনে নিতে বলে নিজের জন্য খাবার কিনতে হোটেলের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু তারা গাড়ি থেকে নামল না। তাদের সঙ্গে থাকা থলের মাঝে তারা হাতড়াতে থাকল।

ওদিকে চালক তাদেরকে হোটলে দেখতে না পেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে এল। দেখল, তারা গাড়িতেই পাশাপাশি বসে আছেন। তাদের হাতে একটি থলে। তার মাঝে শুকনো কিছু রুটির টুকরা। আর তাদের হাতের সামনে পানি ভর্তি একটি পাত্র। তারা পানিতে রুটি ভিজিয়ে খাচ্ছেন। তাদের এ করুণ দশা দেখে চালকের মায়া জাগল। সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের জন্য কিছু ভাত ও গোশত নিয়ে এল, তাদেরকে তা দিতে চাইলে তারা নিতে অনাগ্রহ ও অস্বীকৃতি প্রকাশ করল। বৃদ্ধ আক্ষেপের সাথে কিছু কথা বলছিল আর তার ও বৃদ্ধার পেটের দিকে ইঙ্গিত করছিল। হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করে কিছু বুঝাতে চাইছিল, কিন্তু চালক আরবী। সে বৃদ্ধের ইঙ্গিত-উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারল না। ইত্যবসরে এক পাকিস্তানী নাগরিকের আগমন ঘটল যে আরবি-উর্দু দুটোই বুঝত। সে তাদের জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কেন এখান থেকে খাচ্ছেন না?

তারা জবাব দিল, আমরা গত বিশ বছর যাবত আমাদের হাতে আসা যাবতীয় সম্পদকে কেবল হজ্জের জন্যই সঞ্চয় করেছি। এভাবে অভুক্ত থেকে আমরা হজ্জের পাথেয় সংগ্রহ করেছি। গত বিশ বছরে আমাদের খাদ্য ছিল কেবল তাই যা তুমি দেখছ। পানিতে ভিজানো শুকনো রুটি। এ খাবার খেয়েই গত বিশ বছর আমরা পার করেছি। এখন আমাদের পেট এ খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, এই গোশত খেলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব এবং তা আমাদের হজ্জের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। বলতে বলতে তাঁর চোখে কান্না চলে এল। সে অব্যাহার ধারায় কাঁদতে লাগল। কেঁদে কেঁদে প্রশ্ন করল, ‘আমরা কখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছব? তুমি কেন আমাদের নিয়ে অযথা বিলম্ব করছ? তুমি আর বিলম্ব না কর। জলদি গাড়ি ছাড়।’ তাদের কণ্ঠে আকুতি ঝরে পড়ল।

পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি মানুষের হৃদয়কে এই বাইতুল আতিকের প্রতি মোহাবিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে এই ঘরের মায়ায় সন্তান, প্রিয়জন,

বন্ধুবান্ধবের কথা তারা অবলীলায় ভুলে যায়। এভাবেই বাইতুল্লাহর প্রেমে পৃথিবীর তাবত প্রেমিকের তপ্ত হৃদয় সিক্ত হয়।

কত বিস্ময়কর তাদের ত্যাগ ও আবেগ! কী আশ্চর্যের কথা যে, তারা হজ্বের খরচ যোগানো নিয়তে সব ধরণের খরচাদি থেকে বিরত থেকেছেন। কেবল সেই কাজেই তাদের সব উপার্জনকে তারা ব্যয় করেছেন যার মাধ্যমে তারা তাদের রবের সান্নিধ্য পেতে পারেন, তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত হতে পারেন। পাকিস্তান থেকে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন থেকে আফ্রিকা দুনিয়ার সর্বত্রই এমন মানুষ রয়েছেন বাইতুল আতিকের কামনায় যাদের হৃদয় আন্দোলিত হয়। আল্লাহর ঘরের দিদারের তামান্নাই যাদের দিনরাতের স্বপ্ন-সাধ।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشِقُّ لَكُمْ لِرُؤُوفٍ رَّحِيمٍ
“এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছাতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত দয়াদ্র, পরম দয়ালু।” [সূরা নাহল : ৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। একবার হারাম শরীফে এক ব্যক্তি প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনকে দেখে প্রশ্ন করল, হে ইবনে সিরীন! আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কোন দেশ থেকে?

ইবনে সিরীন জবাব দিলেন, আমি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি। ইরাক থেকে এসেছি।

ঐ ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, ইরাক থেকে?! তাহলে তো বলতে গেলে আপনি হারামের প্রতিবেশী।

ইবনে সিরীন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

সে জবাব দিল, আমি ‘মা ওয়ারাআন নাহার’ (বর্তমান উজবেকিস্তান) থেকে এসেছি। পাঁচবছর আগে হজ্বের উদ্দেশ্যে দেশ থেকে বের হয়েছি। আজ হারামে এসে পৌঁছলাম।

এটা সেই যামানার ঘটনা যে যামানার সার্বিক অবস্থানুসারে উজবেকিস্তান থেকে মক্কায় আসতে পাঁচ বছর লেগে যাওয়ার বিষয়টিকে অবাস্তব মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ এর সাথে কেবল পথের দূরত্বের বিষয় জড়িত ছিল না, বরং অনেক সময় পশ্চিমধ্যে সফরকারীদের পাথেয় শেষ হয়ে যেত। ফলে যে শহরে পাথেয় শেষ হয়ে যেত, সেখানেই কিছুকাল তারা অবস্থান করতেন। কাজ করতেন। উপার্জন করতেন। নতুন করে পাথেয় সংগ্রহ করতেন। তারপর আবার সফর শুরু করতেন। তাছাড়া সে সময়ের যাতায়াত ব্যবস্থার নায়ক হালত তো ছিলই। সব মিলিয়ে সফরে তাদের এত দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে যেত।

কত আবেগ ভরা হৃদয়! কত কাফেলা ও বন্ধুজন! কত ক্লান্তি ও মোজাহাদা! এই ঘরের জন্য!

কবির ভাষায়-

إذا رأت أبصارهم بيته الذي * قلوب الورى شوقا اليه تضرم

الى الكعبة البيت الحرام عشية * وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا

كانهم لم ينصبوا قط قبله * لأن شقاهم قد ترحل عنهم

هنالك لا تريب يوما على إمرء * إذا ما بدا منه الذي كان يكتم

فله كم من عبرة مهراقة * وأخرى على أثارهم لا تقدم

ولله أكباد هنالك أودع الغر * أم بها فالنار فيها تضرم

ولله أنفاس يكاد بجرها * يذوب المحب المستهام المتيم.

অর্থ : “তাদের নয়ন যখন তাঁর সেই ঘর অবলোকন করে যার ভালোবাসায় সমস্ত মাখলুকের হৃদয় জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়। সেই বাইতুল হারাম কাবার সাথে তারা মিলিত হয় সন্ধ্যা বেলায় আর তার চারদিকে তওয়াফ করে সাতবার। সালাত আদায় করে, দরুদ পড়ে। তাদের কলব কখনো ক্লান্ত হয় না। কারণ দুঃখ কষ্ট তাদের ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। সেখানে তাদের প্রতি কোনো দোষারোপ নেই যদি তারা প্রকাশ করে সেই নিগূঢ়

ভালোবাসা, যা এতদিন গোপন ছিল। কত অশ্রু সেথায় গড়িয়ে পড়ে তাঁর ভালোবাসায়।

সেই কাফেলার চেয়ে চমৎকার দৃশ্য আর কিসের দৃশ্য হতে পারে? জ্ঞানীর চোখে তার চেয়ে মনোহর আর কী দৃষ্টিগোচর হতে পারে? এহরামের ধুলার চেয়ে পবিত্র কোনো সৌরভ আপনি পেয়েছেন কি? হাজী ও উমরাকারীর পোষাকের চেয়ে সুদর্শন কোনো পোষাক আপনি দেখেছেন কি? হলক ও কসরকারীদের শিরের চেয়ে সম্মানিত কোনো শির আপনার নজরে পড়েছে কি? তওয়াফকারীদের কাফেলার চেয়ে মর্যাদাশীল আর কোনো কাফেলা আপনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে কি? তালবিয়া পাঠকারীদের তালবিয়া, তওবাকারীদের কান্নার রোল, ভীতসন্ত্রস্তদের 'আহ' আওয়াজ আর হৃদয়ভাঙ্গা আশেকদের মুনাজাতের কণ্ঠের চেয়ে সুমিষ্ট কোনো কবিতা আপনি শুনেছেন কি?"

হজ্জ এমন একটি ইবাদত যাতে কলব ও আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যের অনুভূতি জাগ্রত হয়। মসজিদে হারামে পড়ে থাকা, আরাফায় অবস্থান ও শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ, পুরনো দিনের স্মৃতিকথা স্মরণ; এসবের সমন্বয়েই হজ্জ।

নিদায়ে ইবরাহীম

হজ্জের সফরে ও প্রতিটি কাজে হাজী সাহেব হযরত ইবরাহীম আ.কে স্মরণ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে চাষাবাদের অযোগ্য অনাবাদী এক ভূমিতে রেখে চলে এসেছিলেন, যেখানে তাদের কোনো পরিচিতজন ছিল না। কোনো সাথী-সঙ্গীও ছিল না। তাদেরকে সেখানে রেখে আসার পর পরম ভালোবাসা নিয়ে তিনি স্বীয় রবের কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা করলেন,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيِّ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مَنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ.

অর্থাৎ হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার বংশধরদের কয়েকজনকে চাষাবাদের অনুপযোগী এক উপত্যকায়, আপনার সম্মানিত গৃহের কাছে বসবাস করালাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যেন নামায কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রিযিক দান করুন, যেন তারা শোকরগুয়ারী করে। [সূরা ইবরাহীম : ৩৭]

হাজী সাহেব শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন আমাদের মহীয়সী জননী হযরত হাজেরা আ.কে যিনি বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী একটি নীরব জায়গায়, উত্তপ্ত প্রান্তরে নিজের জন্য ও স্বীয় দুঃখপোষ্য শিশু ইসমাইলের জন্য পানির অনুসন্ধান করছিলেন। একাকী একজন নারী ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে পানির তালাশে সাফা ও মারওয়্যার মাঝে দ্রুত দৌড়াচ্ছিলেন। পিপাসা তাঁকে কাতর করে ফেলেছিল। ক্লান্তি তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছিল। সন্তানের শঙ্কা তাঁকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। পানির খোঁজে সাতবার তিনি সাফা-মারওয়্যায় দৌড়ালেন। অজানা যমযমের সন্ধানে তিনি ব্যাকুল হলেন যে যমযম উথলে উঠেছিল ইসমাইলের মুবারক কদম থেকে। আজ সেই বিজন উপত্যকা সবুজের সমারোহ ও আয়েশে পূর্ণ!

হাজী সাহেব স্মরণ করেন সেই শিশু ইসমাইলকে যিনি তাঁর পিতার সাথে বাড়ি ছেড়েছিলেন। তাঁর পিতাকে যখন আদেশ করা হয়েছিল কলিজার টুকরা একমাত্র সন্তানকে যবেহ করতে তখন পিতা সন্তানকে বললেন-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ يَا إِبْرَاهِيمُ.

অর্থাৎ অতঃপর সে ছেলে যখন তাঁর সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্ন দেখি যে, আমি তোমাকে যবাই করছি। অতএব তুমি চিন্তা করে দেখ, তোমার অভিমত কী? তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনার প্রতি যে নির্দেশ হচ্ছে আপনি তা পালন করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

অতপর তারা উভয়ে সমর্পিত হলেন এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন। তখন আমি তাঁকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তার বিনিময়ে একটি বিরাট যবাইয়ের পশু দান করলাম। [সূরা সাফফাত: ১০২-১০৭]

এরপর হাজী সাহেব স্মরণ করেন পিতাপুত্র ইবরাহীম ও ইসমাইল আ.কে যখন তারা পরিপূর্ণ তওবা ও একাগ্রতা সহকারে বাইতুল্লাহর ভিত্তি নির্মাণ করছিলেন, আর দুআ করছিলেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব শুনে ও জানেন। [সূরা বাকারা : ১২৭]

নির্মাণ যখন পূর্ণ হল, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীমকে আদেশ করলেন, মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দিতে। ইরশাদ হয়েছে,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

অর্থাৎ আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও। লোকেরা তোমার কাছে চলে আসবে পদব্রেজে এবং দুর্বল উটসমূহে, যেগুলো সুদূরপথ অতিক্রম করে পৌঁছবে। [সূরা হজ্ব : ২৭]

ইবরাহীম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! আমার আওয়াজ কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছবে?

আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, হে ইবরাহীম! তোমার দায়িত্ব ঘোষণা দেওয়া আর আমার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া। এরপর ইবরাহীম আ. একটি উঁচু ভূমিতে আরোহন করে মানুষকে আল্লাহর দিকে, বাইতুল্লাহর হজ্জের প্রতি আহ্বান করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ কুদরতের মাধ্যমে ইবরাহীমের ঘোষণাকে দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছে দিলেন। ফলে মানুষ বহু দূরবর্তী স্থান হতে পায়দল ও সওয়ারীতে আরোহন করে বাইতুল্লাহর জিয়ারতে আসতে লাগল। ইবরাহীম আ.এর সাথে আল্লাহ তাআলার কৃত

ওয়াদা সেই দিন থেকে আজো, এমনকি ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকবে। মানুষের হৃদয় বাইতুল্লাহর প্রতি মোহাবিষ্ট থাকবে। তার তওয়াফ ও এহরাম চলমান থাকবে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম আ.এর প্রদত্ত ডাকে সাড়া দিতে ছুটে আসে। আল্লাহ তাআলা মক্কার এই মর্যাদা ও সম্মান সব সময় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

হারাম শরীফের মর্যাদা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেদিন আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই এই নগরীকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন। এই সম্মান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এখানের কোনো কাঁটাকে ব্যথ্যা দেয়া যাবে না। কোনো শিকারকে তাড়ানো যাবে না। মালিকের পরিচয় জানা ছাড়া কোনো পড়ে থাকা বস্তুকে কুঁড়ানো যাবে না। এখানকার নির্জনতাকে ভঙ্গ করা যাবে না।

মক্কা হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরী। যে এতে ফাসাদ সৃষ্টির পরিকল্পনা করবে সে তা বাস্তবায়ন করতে না পারলেও তাকে শাস্তি পেতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি সেখানে জুলুমের সাথে ইচ্ছাপূর্বক ধর্মবিরোধী কাজ করবে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করাব। [সূরা হজ্জ : ২৫]

হযরত ইবনে ওমর রাযি. হারামের সীমানার বাইরে মক্কার প্রান্ত সীমানায় হালাল এলাকায় স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন আর তার মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন হারাম এলাকার অভ্যন্তরে। তাকে বলা হল, আপনার বাড়ি যদি মসজিদের কাছে নিয়ে আসতেন তাহলে তা কতই না ভাল হত! তিনি জবাব দিলেন, ‘সওয়াব সেখানে সর্বাধিক নয়, কিন্তু অপরাধ সেখানে মারাত্মক!’ তিনি আশঙ্কা করতেন, তাঁর বাড়ি যদি হারামের অভ্যন্তরে হয় তাহলে

বাড়িতে থাকাবস্থায় কখনো কোনো কথা বলতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে বা তার পরিবারের কেউ হারাম এলাকায় কোনো গোনাহে লিপ্ত হলে তা অন্য জায়গায় গোনাহের লিপ্ত হওয়ার তুলনায় মারাত্মক হিসেবে বিবেচিত হবে।

হায়! কী অবস্থা দাঁড়াত যদি ইবনে ওমর রাযি. আজ মক্কার চিত্র দেখতেন! আজ এই হারাম নগরীতে আজ রিবার লেনদেন হচ্ছে। এখানে মদপান করা হচ্ছে। নেশাজাত দ্রব্যের সয়লাব হয়ে গেছে এই হারাম নগরীতে। ফিতনা ও হারাম বিনোদনের উপকরণ যেমন হারাম যন্ত্রপাতি, ধূমপানের বিস্তৃতি ঘটেছে এই হারাম নগরীতে। এ সব তো নিঃসন্দেহে কিয়ামতের আলামত।

কত আফসোস আর দুঃখের কথা যে, জাহেলী যুগেও কাফেররা এই নগরীর সম্মানকে ভঙ্গ করত না, অথচ উম্মাতে মুহাম্মাদী আজ এই নগরীর সম্মান ও মর্যাদাকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। জাহেলী যুগের মা তার সন্তানকে অসীয়াত করত-

إبني لا تظلم بمكة * لا الصغير ولا الكبير

إبني من يظلم بمكة * يليق آفات الشرور

إبني قد جربتها * فوجدت ظلما يبور.

অর্থ : হে বৎস! এই মক্কায় ছোট বড় কারো প্রতি জুলুম কর না। বৎস! যে এতে জুলুম করবে সে মারাত্মক বিপদাপদে পতিত হবে। বৎস! আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এটা বললাম। কারণ এক জালেমকে আমি ধ্বংস হতে দেখেছি।

আবরাহা যখন মক্কা নগরীকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে এসেছিল আব্দুল মুত্তালিব পূর্ণ আস্থার সাথে তাকে বলেছিলেন, 'এ ঘরের একজন রব আছেন। তিনিই একে রক্ষা করবেন। বাস্তবেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র ঘরের মর্যাদাকে সেদিন রক্ষা করেছিলেন। আবরাহা বাহিনীর উপর আবাবীল পাখি পাঠিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনেও কাবার মর্যাদা লঙ্ঘনকারী আবরাহার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে,

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

অর্থাৎ তিনি তাদের ওপর আবাবিল পাখি পাঠালেন। যারা তাদের ওপর পাঁকা মাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করল। ফলে তাদেরকে ভক্ষিত খড়কুটায় পরিণত করল। [সূরা ফিল: ৩-৫]

আবরাহা বাইতুল্লাহকে অসম্মান করতে চেয়েছিল। সে আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অথচ বাইতুল্লাহ স্বসম্মানে বহাল রয়েছে। যুগে যুগে সকল আশ্বিয়ায়ে কেরাম এই বাইতুল্লাহর হজ্জ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ

সহীহ সূত্রে মুস্তাদরাকে হাকমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সফরের পথে ওয়াদিল আযরাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন জায়গা? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, এটা ওয়াদিল আযরাক। তিনি বললেন, আমি যেন এখানে হযরত মুসা বিন ইমরানের অবতরণস্থল দেখতে পাচ্ছি, তিনি তাকবীর বলতে বলতে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করছেন।

এরপর তিনি একটি সরুপথে উপনীত হলে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন পথ? সাহাবিগণ জবাব দিলেন, এটা অমুক পথ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যেন হযরত ইউনুস বিন মাতাকে দেখতে পাচ্ছি একটি কোঁকড়ানো লাল উটনীর উপর আরোহী। উটনীর নাকে শুকনো আশের রশি। তিনি তালবিয়া পাঠরত। তাঁর গায়ে পশমের জুবা জড়ানো।

এভাবে কত শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে স্মরণীয় কত কাফেলার বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। এরপর এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ। তিনি এই কাবার আশপাশেই উত্তম প্রান্তরে ঘুরেফিরে শৈশব ও কৈশর কাটিয়েছেন। ইতিমধ্যে কুরাইশরা কাবা পুনর্নির্মাণ করল। এরপর হজ্জের আসওয়াদ প্রতিস্থাপন নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। স্বীয় মুবারক হাতে হজ্জের আসওয়াদকে স্বস্থানে প্রতিস্থাপন করলেন।

এরপর আরো সময় অতিক্রান্ত হল। তিনি শেষনবী হিসেবে নবুওত প্রাপ্ত হলেন। হারাম নগরী থেকে বহিস্কৃত হলেন। তারপর আবার হজ্জের জন্য আদিষ্ট হলেন। লোকালয়হীন এলাকাগুলো পার হয়ে তিনি বাইতুল্লাহর দিকে ধাবিত হচ্ছিলেন; বিদায় হজ্জের মাধ্যমে জীবনকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি হজ্জ আদায় করছিলেন আর চারপাশে সাহাবায়ে কেরাম হৃদয়ভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন! তিনি হজ্জ আদায় করছিলেন আর তাঁর সাহাবিদের বলছিলেন, 'আল্লাহর কসম! হয়ত এ বছরের পর আমি আর তোমাদের সাথে মিলিত হব না।'

আমরা সকলেই তাঁকে স্মরণ করি। আমরা স্মরণ করি সেই পবিত্রতম আত্মাকে যা ইহরাম বেঁধেছিল। সেই পরিশুদ্ধতম রুহকে যা সেদিন উল্লসিত হয়েছিল। সেই মুবারক কদমের যা সেদিন তওয়াফ ও সাযী করেছিল। সেই সুমিষ্ট ঠোঁটের যা সেদিন তাকবীর ও তাহলীল কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। সেই মুবারক হাতের যা সেদিন হজ্জারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছিল ও পাথর নিক্ষেপ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জ আদায় করছিলেন। হজ্জের জায়গাসমূহ বদল করছিলেন আর তাঁর আওয়াজ চারদিক মুখরিত করছিল, **لِيَاكُ اللَّهُمَّ لِيَاكُ لِيَاكُ لِيَاكُ لِيَاكُ** এক পা উঠাচ্ছিলেন আরেক পা রাখছিলেন। তখনো তিনি নিশ্চিতরূপে জানতেন না যে, বালাদুল হারামে এই তাঁর শেষ পদচারণা।

হারাম শরীফের সীমানায় উপস্থিত হতেই ইতিহাসের পাঠক হাজী সাহেবের মনে পড়ে যাবে বাইতুল্লাহর নির্মাণকালে পিতা হযরত ইবরাহীম আ.এর দুআ। তিনি স্বীয় রবের কাছে দুআ করেছিলেন, **رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** (অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের প্রতি তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠান যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবে। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইবরাহীম আ.এর সেই বরকতময় দুআরই ফসল।

পবিত্র এহরাম, বিন্দ্র হৃদয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জরে আসওয়াদের সান্নিধ্যে যাচ্ছিলেন, নিজেকে তিনি সম্বরণ করতে পারছিলেন না। হৃদয় তাঁর বিগলিত, চোখ তাঁর অশ্রুসজল। অশ্রু ফোটাগুলো তাঁর গণ্ডদেশ দিয়ে টপটপ করে গড়িয়ে কাবার যমীনকে সিক্ত ও সুবাসিত করছিল। তিনি ওমর বিন খাত্তাবের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওমর! এখানেই ঝরে পড়ে অশ্রু।' ইবনুল জাওযী বিদায় হজ্জের সুন্দর চিত্রায়ন করেছেন। তাঁর ভাষায়

كأنني برسول الله مرتدياً * ملابس الطهر بين الناس كالقمر
نور وعن جانيه من صحابه * فيالق وألوف الناس بالأثر
ساروا برفقة أزكى مهجة درجت * وخير مشتمل ثوباً ومؤثر
ملياً رافعاً كفيه في وجل * لله في ثوب أوّابٍ ومفتقر
مرغماً بجلال الحق تغلبه * دموعه مثل وابل العارض المطر
يمضي ينادي خذو عني مناسككم * لعل هذا ختام العهد والعمر
وقام في عرفات الله ممتطياً * قصواءه يا له من موقف نصير
تأمل الموقف الأسمى فما نظرت * عيناه إلا لأمواج من البشر
فينحني شاكراً لله منته * وفضله من تمام الدين والظفر
يشدو بخطبته العصماء زاكية * كالشهد كالسلسيل العذب كالدرر
مجلياً روعة الإسلام في جمل * من رائع من بديع القول مختصر
داع إلى العدل والتقوى وأن بها * تفاضل الناس لا بالجنس والصور
مبيناً أن للإنسان حرمة * ممرغاً سيء العادات بالمد.

অর্থ : আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র পোশাক পরিহিত অবস্থায় মানুষের ভীড়ে উজ্জল চাঁদের ন্যায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি আলোকবিত্তকা। তাঁর দু'পাশে সাহাবিদের বিশাল জামাত আর পেছনে রয়েছে হাজারো জনতা, যারা এমন বন্ধুর সাথে সফর করেছেন যিনি পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী আর চাদর-ইয়ার পরিহিত। অভাবী, দরিদ্রের

বেশে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তিনি তালবিয়া পাঠরত। চোখে তাঁর শাবণ নেমেছে। যা তাঁর রবের মহত্বের বর্হিপ্রকাশ ঘটাবে। তিনি অগ্রসর হচ্ছেন আর বলছেন, তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের আহকাম শিখে নাও। হতে পারে, এটাই আমার শেষ হজ্জ। আরাফায় কাসওয়া নামক উটের পিঠে তিনি আরোহিত। আহা! কত মনোরম সেই দৃশ্য! তিনি বারবার ময়দান জুড়ে তাকাচ্ছেন। তাঁর দু'চোখ কেবল জনতার শ্রোতাই দেখতে পেল। তিনি স্বীয় রবের দানের শোকরিয়া আদায় করলেন। দীন ও দুনিয়ার সফলতার পূর্ণতা দানের বন্দনা গাইলেন। তারপর তিনি সেই নিষ্পাপ খুতবা প্রদান করলেন যা থেকে যেন সালসাবিলের ন্যায় জান্নাতের সুমিষ্ট মধু আর মুক্তা ঝরে পড়ছিল। তাঁর অনুপম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ইসলাম তার আপন বিভায় উদ্ভাসিত হচ্ছিল। তাঁর আহবান ছিল, ইনসাফ ও তাকওয়ার। তাঁর ভাষায় এই হচ্ছে, পার্থক্যের মাপকাঠি। জাতপাত বা শ্বেত-কালোতে কোনো বৈষম্য নেই। তিনি ইসলামের মর্যাদা বর্ণনা করছিলেন আর অসৎ চরিত্রের ব্যাপারে সাবধান করছিলেন।

তিনি আরাফায় অবস্থান করছেন। কিবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআয় কাটাচ্ছেন। তাঁর সামনে লক্ষাধিক হাজীর কাফেলা। যারা ঘাড় উঁচু করে তাঁকে দেখছিল। কানে ছিল নিচ্ছিন্ন নিস্তব্দতা। ছোট-বড়, বৃদ্ধ-যুবা, শিশু-কিশোররা পর্যন্ত তাকে এক নজর দেখার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল।

সবার উপস্থিতিতে তিনি সর্বজনীন ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি ভাষণ দিলেন, যাতে হালালকে হালাল আর হারামকে হারাম সাব্যস্ত করলেন। নিজেকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে উপস্থাপন করলেন। তাওহীদের প্রতীকগুলোকে তিনি পুণরুজ্জীবিত করলেন। শিরক ও মূর্তিপূজার প্রতীকগুলোকে বিলীন করে দিলেন। জাহেলী যুগের রিবাকে প্রত্যাহার করে নিলেন। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের নিনাদকে সমূলে বিনাশ করলেন। সবার জন্য সবার মাঝে শান্তির সুবাতাস ছড়িয়ে দিলেন। বললেন, নিশ্চই তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানিত; যেমন সম্মানিত আজকের দিন, আজকের মাস, তোমাদের আজকের এই শহর। হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের আল্লাহর বাণী যথাযথ পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

তিনি শেষবারের মতো তাঁর সাহাবিদের প্রতি তাকাচ্ছিলেন। আবু বকর, ওমর, উসমান, আলীর প্রতি তাকাচ্ছিলেন। দেখছিলেন, যুবায়ের ও তালহাকে। কত রাত তারা তাঁর সাথে কাটিয়েছে। কতদিন তাঁর সাথে রোযা রেখেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাফেরদের সাথে লড়াই করেছে। তিনি তাকিয়ে দেখছিলেন, সমগ্র জনতাকে, সাদা-কালো, স্বাধীন-গোলাম, আরবী-আজমীর বিশাল জন সমুদ্রকে। এরপর বিশাল এই জন সমুদ্রকে লক্ষ্য সমুচ্চ স্বরে করে প্রশ্ন করলেন, আমি কি আমার রবের বাণী তোমাদের প্রতি পৌঁছিয়েছি? সকলেই জবাব দিল, হ্যাঁ, আপনি যথাযথই পৌঁছিয়েছেন।

এরপর তিনি তাঁর দৃষ্টিকে আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' এরপর তিনি যমীনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আসমান থেকে আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি চেয়ে রইলেন। তিনি ফেরেশতাদের সাথে গর্বভরে বলছিলেন, আমার বান্দাদেরকে দেখ! তারা আমার রহমতের প্রত্যাশায় বহু দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে ধুলোয় ধূসরিত, এলোমেলো চূলে আমার কাছে এসেছে। অথচ তারা আমার জাহান্নামের আযাব দেখেনি। তারা আমার জান্নাতের নিয়ামত দেখেনি। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করছিলেন। সাহাবায়ে কেলামও দুআ করছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন। তারাও কাঁদছিলেন। এরপর তিনি তাদের নিয়ে হজ্জের বিভিন্ন স্থানে গেলেন। সকলের মুখে একই ধ্বনি। একই তালবীয়া। তাওহীদের তালবীয়া হচ্ছে "لَبِّكَ اللَّهُمَّ لَبِّكَ لَبِّكَ لَا شَرِيكَ" "لك لبيك"। ইবনুল জাওয়াযী বলেন-

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ إِذْ حَضَرُوا * مُتَمِّعَ الْقَلْبِ وَالْأَسْمَاعِ وَالْبَصَرِ
وَأَتَّبِعِي لِرَسُولِ اللَّهِ أَثْمُهُ * عَلَى جَبِينِ نَقِي طَاهِرٍ عَطِرٍ
أَقْبَلُ الْكَفَّ كَفَّ الْجُودِ كَمْ بَدَلْتُ * سَحَاءً بِالْخَيْرِ مِثْلَ السَّلْسَلِ الْهَدِيرِ
أَلُوذُ بِالرَّحْلِ أَمْشِي فِي مَعِيَّتِهِ * وَأَرْتَوِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالنَّظَرِ
أَسْرُ بِالْمَشْيِ إِنْ طَالَ الْمَسِيرُ بِنَا * وَمَا انْقَضَى مِنْ لِقَاءِ الْمُصْطَفَى وَطَرِي

أَلَا الرَّكَاةُ الَّتِي حُجَّ الْخَيْبُ بِهَا * يَا لَيْتَهُ كَفَّنَ لِي فِي دُحَى الْخَفَرِ
يَا غَايِلًا مِنْ مَزَايَاهُ وَرَزَاغِيهَا * يَمُومُ إِلَى كُتُبِ التَّارِيخِ وَالسَّيْرِ
يَا رَبِّ لَا تُخْرِمْهُ مِنْ شَفَاعَتِهِ * وَخَوْضِهِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْمَوْقِفِ الْعَسِيرِ.

অর্থ : হায়! সাহাবায়ে কেরাম যখন হজে উপস্থিত হলেন, তখন আমি যদি তাদের মাঝে থাকতে পারতাম তাহলে আমার হৃদয়, কান ও চোখ জুড়াতাম! রাসূলুল্লাহর সামনে এসে তাঁর পবিত্র স্বচ্ছ ললাটে চুমু খেতাম। তাঁর বদান্যতার হস্তে যা থেকে উপচে পড়া ঝর্ণার ন্যায় অকাতরে তিনি সম্পদ ব্যয় করেছেন। তাঁর সাথে হেটে হেটে আমার ঠিকানায় পৌঁছে যেতাম। তাঁকে দেখে দেখে প্রবোধ লাভ করতাম। চলার পথ দীর্ঘ হলে উচ্ছাস আরো বৃদ্ধি পেত। তাঁর দর্শনে আমার প্রেমাবেগ কখনোই পরিতুষ্ট হত না। যে চাদর গায়ে জড়িয়ে তিনি হজ্জ পালন করেছেন, তা যদি অন্ধকার কবরে আমার কাফনের কাপড় হত! এই নয়নাভিরাম দৃশ্য থেকে হে উদাসীন! ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থ খোল। হে আমার রব! হাশরের কঠিন দিনে তাঁর শাফাআত থেকে আমাকে মাহরুম কর না।

বছরের পর বছর, শতাব্দির পর শতাব্দি পেরিয়ে যাচ্ছে। ঈমানের এই সম্মেলন, বাৎসরিক এই মহামিলনে আল্লাহর আশেকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে, কত গহীন গিরিপথ থেকে লোকেরা এই শস্য ও চাষাবাদের অযোগ্য স্থানে ছুটে আসছে। এখানে বাহ্যত এমন কিছু নেই যা মনোরঞ্জনের কারণ হতে পারে। তারপরও এই আগমন কেবল আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য। আরাফায় দাঁড়িয়ে লাক্ষাইক বলার জন্য।

নূরাণী কাফেলার নয়নাভিরাম দৃশ্য

আল্লাহর আশেকীদের এই দলের প্রতি তাকালে বিস্মিত হতে হয়, তাদের নিয়ে ভাবলে প্রেম ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। মনে হয় যেন ঈমানের শোভাযাত্রা। ইবাদুর রাহমানের কাফেলা। যারা এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণ প্রেম ও আনুগত্যের সাথে। যবান তাদের নিবেদিত আল্লাহর যিকিরে। চোখে তাদের

শাবণের বারিধারা রহমানের রহমত ও অনুগ্রহ কামনায়। তাকবীর তাদের হুকুম। তাসবীহ তাদের কথা। তালবিয়া তাদের যিকির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাদের দুআ। ইবাদত তাদের চলন। নামায তাদের উৎসব। সফর তাদের আল্লাহর ও আখেরাতের। লক্ষ্য তাদের আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা। যারা আপন শহর ছেড়েছে। ঘর ছেড়েছে। পরিবার-পরিজন ছেড়েছে। কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়েছে। সহ্য করেছে ক্লান্তি, কষ্ট ও বেদনা। তাদের জন্য কোনো দাওয়াতের আয়োজন হয়নি। লোকেদের পক্ষ থেকে কোনো হাদিয়া বা উপহারের ব্যবস্থা হয়নি। তা সত্ত্বেও নিজের সম্পদ খরচ করে, নিজের ঘর-বাড়ি ও পরিবার ছেড়ে তারা আল্লাহর ঘরের মুসাফির হয়েছে। কবির ভাষায়,

وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة *** ولم تنهم لذاتهم والتنعيم
يسرون في أقطارها وفجاجها *** رجالا وركبانا والله أسلموا
ولما رأت أبصارهم بيته الذي *** قلوب الورى شوقا إليه تضرم
كانهم لم ينصبوا قط قبله *** لأنهم شقاهم قد ترحل عنهم
فله كم من عبرة مُهْرَاقَة *** وأخرى على آثارها لا تقدم

অর্থ : তারা তোমাকে পাওয়ার আশায় স্বদেশ, পরিবার ও পরিজন ত্যাগ করেছে। স্বার্থ বা ভোগের জন্য নয়। স্বদেশের ভূখন্ড ও গিরিপথ পেরিয়ে পায়ে হেটে বা আরোহন করে তারা আপন গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। মৃদু সমীরণকে জিজ্ঞেস করে দেখ! কত গভীর প্রেম ও ভালোবাসাকে সে বয়ে বেড়াচ্ছে। এতে কোনো গোপনীয়তা নেই। কারণ সেই তো ভালোবাসার ঘ্রাণ ছড়ায়। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে না দেখে কত কাল ধৈর্য ধরবে, অথচ বেদনার আগুন তার হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আরাফার মাহাত্ম্য

আপনি কি কখনো আরাফার সমাবেশ লক্ষ্য করেছেন যেদিন অশ্রুর নালা বয়ে যায়, গোনাহ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়? সূর্যোদয়ের দিনগুলোর শ্রেষ্ঠদিন আরাফার দিন। হজ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে, আরাফায়

অবস্থান। সর্বোত্তম দুআ হচ্ছে, আরাফার দুআ। এদিনেই আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। বদরের দিন ছাড়া শয়তানের চেহারা আর কখনো এত অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও কদাকার হয় না যতটা আরাফার দিন হয়ে থাকে।

আরাফার দিন আল্লাহ তাআলা হাজীদের দিকে তাকিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন। এ দিনে যে ক্ষমা বঞ্চিত রইল, সে আর কবে ক্ষমা পাবে? কত গোনাহগার আরাফায় অপরাধী হয়ে প্রবেশ করে আর আল্লাহ তাআলার কাছের বান্দা ও তাঁর অলী হয়ে সেখান থেকে বের হয়। কত দাগী অপরাধী অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সেখানে প্রবেশ করে, অথচ সদ্যপ্রসূত সন্তানের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বের হয়। কবির ভাষায়,

فلو أبصرت عيناك موقفهم بها * وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا
ينادونه يا رب يا رب إنا * عبيدك لا ندعو سواك وتعلم
وها نحن نرجو منك ما أنت أهله * فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم

فلا ترى إلا خاشعا متذللا * وآخر ييكي ذنبه يترنم

.. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا * لعزة من تعنوا الوجوه وتسلم

يلبون بالنداء: لبيك ربنا * لك الحمد والملك الذي أنت تعلم

دعاهم فلبوا رضا ومحبة * فلما دعوه كان أقرب منهم

تراهم على الرمضاء شعنا رؤوسهم * وغبرا وهم فيها أسر وأنعم

لو كان يرضي الله نحر نفوسهم * لجادوا بها طوعا وللأمر سلموا

كما بذلوا عند الجهاد نحورهم * لأعدائه حتى جرى منهم الدم

فله ذلك الموقف الأعظم الذي * كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم

وقد شرقت عين المحب بدمعها * فينظر من بين الدموع ويسجم

ويدنوا الجبار جل جلاله * يباهي بهم أملاكه فهو أكرم

يقول: عبادي قد أتوني محبة * وإني بهم بر أجود وأكرم

فكم من عتيق فيه كمل عتقه * وآخر يستسعى وربك أرحم

وما روى الشيطان أغىظ في الورى * واحقر منه عندها وهو الأم
 وذاك لأمر قد رآه فغاظه * فأقبل يحثوا الترب غيظا ويلطم
 لما عينت عيناه في رحمة أتت * ومغفرة من عند ذي العرش تقسم
 أتى ما أتى حتى ظن أنه * تمكن من بنيانه فهو محكم
 أتى الله بنيانا له من أساسه * فخر عليه ساقطا يتهدم
 فبشراكم يا أهل ذالموقف الذي * به يغفر الله الذنوب ويرحم.

অর্থ : ‘তুমি যদি আরাফায় তাদের অবস্থান দেখতে, যখন তারা রহমতের আশায় দু’হাত প্রসারিত করেছিলেন। তারা ডাকছিলেন, আয় আমাদের রব! আয় আমার রব! আমরা তো তোমারই গোলাম। তুমি জান, আমরা তোমায় ছাড়া কাউকে ডাকি না। তোমার শান অনুসারে আমরা তোমার কাছে আশা করি। তুমি যে অফুরান দাতা ও অশেষ দানশীল। তুমি যদি তাদের দেখতে বিনয়ী ও অবনত অবস্থায়, অপরাধের দায়ে কান্নারত। তারা তাদের রবের সামনে বিনীত হয়ে দাঁড়িয়ে যার সামনে সকল বস্তু আত্মসমর্পণ করে। যার সকাশেই সব কিছু নীত হয়। তারা বলছিলেন, হে আমাদের রব! আমরা তোমার দরবারে হাযির। তুমিই মালিক, সকল প্রশংসা ও কতৃত্ব কেবলই তোমার। তিনি তাদের ডেকেছেন। সেই ডাকে তারা সাড়া দিয়ে হাযির হয়েছেন। আর তারা যখন তাঁকে ডেকেছেন, তিনি তার চেয়েও দ্রুততার সাথে সাড়া দিয়েছেন। যদি তুমি তাদের দেখতে প্রখর রোদ্দতাপে উত্তপ্ত ভূমিতে ধুলিমলিন, এলোমেলো কেশে। সবকিছু এলোমেলো, তবু এতেই তারা খুশি ও আনন্দিত। প্রাণোৎসর্গ করলে আল্লাহ তাআলা যদি সন্তুষ্ট হতেন তাহলে নির্দিধায় তারা তা করতেন। আল্লাহর কাছে নিজেকে নিবেদিত করতেন। যেমন তারা প্রাণ দিয়েছেন জিহাদের ময়দানে; দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, দেহ থেকে রক্ত ঝরিয়ে। মহান আরশের অধিপতি তো কেবলই আল্লাহ তাআলা যার প্রকাশ ঘটবে কিয়ামত দিবসে, বরং তিনি তো তার চেয়েও মহান। সেখানে চোখের পানিতে প্রেমিকের চোখে জোয়ার আসে। চোখের প্রতিটি ফোটায় ফোটায় প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে দেখতে পায়। এমন প্রেমিকদেরকে কাছে টেনে নিয়ে রাব্বুল আলামিন যখন ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, মর্তের মানুষের সম্মান তখন আকাশের ফেরেশতাদেরও ছাড়িয়ে যায়। তিনি ঘোষণা করেন, আমার

বান্দারা আমার ভালোবাসায় আমার দরবারে হাযির হয়েছে। কাজেই আমি তাদের প্রতি ইনসাফ করব। দান ও নিয়ামতে তাদের ভরে দেব। কত আঘাদের আযাদী তখন পূর্ণতা পায়। কতজন তখনো সাধনায় রত। তাদের রব তাদের প্রতি দয়াশীল। ধরার অন্য কোথাও শয়তানকে এতটা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ দেখা যায় না, যতটা দেখা যায় কাবার সন্নিকটে। সঙ্গত কারণেই শয়তান তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। ফলে সে রাগে মাটি চাপড়াতে চাপড়াতে পালিয়ে যায়। সে যখন দেখেছিল, আরশের মালিকের পক্ষ থেকে রহমতের ঝর্ণা বইছে, ক্ষমা বণ্টন করা হচ্ছে, তখন সেও হাযির হল। ভাবল, যে ইমারত সে নির্মাণ করেছে তা বড় মযবুত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করলেন। ফলে তার ইমারতের ছাদ তার উপরই ধসে পড়ল। ধন্য তারা যারা সেই স্থানের অধিবাসী যেখানে গোনাহ ক্ষমা করা হয়। রহমতের ধারাপাত হয়।’

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আরাফার এই পাথুরে ভূমিতে কত গোনাহ ক্ষমা হয়। কত দোষ ঢাকা পড়ে যায়। কত প্রয়োজন পূরণ করা হয়। কত বিপদাপদ দূর করা হয়। কত মসীবত উঠিয়ে নেয়া হয়। কত নিয়ামত নবায়ন করা হয়। কত ভাগ্যবানে কিসমত জুটে যায়। কত হতভাগ্যের দুর্দশার অবসান হয়।

এত বিশাল কাফেলা! এত বৃহজ্জ সন্মেলনে একই মুহর্তে বিভিন্ন ভাষায় কতজন কত রকম প্রয়োজন এক রবের কাছে তুলে ধরে। কেউ আরবী, কেউ উর্দু, কেউ হিন্দি, কেউ বাংলায়। এভাবে বিভিন্নজন তার বিভিন্ন প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একই রবের কাছে উপস্থাপন করে।

কেউ অপরাধী। সে তার রবের কাছে গোনাহ মার্ফের জন্য দুআ করছে। কেউ অসুস্থ। সে দুআ করছে তার রোগ নিরাময়ের। কেউ দরিদ্র। সে দুআ করছে ঋণ পরিশোধের। কেউ মাজলুম। সে দুআ করছে সাহায্যের। কেউ পথহারা। পথের দিশার দুআ করছে। এভাবে বিভিন্নজন বিভিন্ন দুআ করছে। আর তাদের রব তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করছেন, দেখ! আমার বান্দারা আমার কাছে এলোমেলো চুল, ধুলোমলিন চেহারায় এসেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের মাফ করে দিলাম।’

সুমহান সেই সত্তা! ভাষার ভিন্নতা যার মাঝে কোনো বৈসাদৃশ সৃষ্টি করে না। প্রয়োজনের ভিন্নতা তার কাছে কোনো সংশয় তৈরি করে না। স্বরের ভিন্নতা তাঁর কাছে কোনো অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে না। প্রার্থীর আধিক্যের পাশাপাশি চাহিদা ও যাচনার আধিক্য ও যাচনার ভিন্নতায় তিনি ক্লান্ত বা বিরক্ত হন না, বরং ভাষার ভিন্নতা ও প্রয়োজনের আধিক্য সত্ত্বেও তাদের চিৎকার ও হৈচৈ তিনি শুনতে পান। কারো কথা শোনা তাঁকে আরেকজনের কথা শোনা থেকে, কোনো দুআ তাঁকে অন্য দুআ থেকে কিংবা কোনো প্রয়োজন তাঁকে অন্য প্রয়োজন থেকে বিরত, ব্যস্ত বা অমনোযোগী করতে পারে না। প্রার্থনার আধিক্য তাঁকে ভুলে নিপতিত করে না। অভাবীর বারংবার পীড়াপীড়ি ও অনুনয় তাঁকে বিরক্ত করে না। তাঁর মহান দৃষ্টি সবকিছুকে, তাঁর জ্ঞান সকলের নিয়তকে, তাঁর অভাবহীনতা সকলের অভাবকে এবং তাঁর ক্ষমতা সকলের অক্ষমতাকে ঘিরে আছে।

একই মুহর্তে তিনি গোনাহ ক্ষমা করতে পারেন। দোষ গোপন করতে পারেন। দুঃখ দূর করতে পারেন। ভাঙ্গাকে জোড়া দিতে পারেন। গরীবকে ধনী বানাতে পারেন। মূর্খকে জ্ঞান দিতে পারেন। পথহারাকে পথ দেখাতে পারেন। ব্যথিতের ব্যথ্যা করতে পারেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে পারেন। অসুস্থকে সুস্থ করতে পারেন। বিপদগ্রস্থকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তওবাকারীর তওবা কবুল করতে পারেন। নেককারকে পুরস্কার দিতে পারেন। মজলুমকে সাহায্য করতে পারেন। পেরেশানের পেরেশানী দূর করতে পারেন। ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্ত করতে পারেন। দিশেহারাকে দিশা দিতে পারেন। দুঃখিতকে সাহায্য করতে পারেন। আব্রুর হিফাজত করতে পারেন। নিরাপত্তাহীনের নিরাপত্তা দিতে পারেন। কোনো জাতিকে উন্নীত করতে আবার অপর জাতিকে লাঞ্ছিত করতে পারেন।

তাঁরই কুদরতী হাতে বান্দার কলবের নিয়ন্ত্রণ। যাবতীয় বিষয়ের লাগাম তাঁরই নিয়ম ও তাকদীরের সাথে যুক্ত। কাজেই তিনিই যিকিরের যোগ্য। মাবুদ হিসেবে প্রতাপশালী। প্রশংসার জন্য শ্রেষ্ঠ। শোকরিয়ার উপযুক্ত। তিনি কাম্য ও সাহায্যকারী হিসেবে অতুলনীয়। তিনি মালিক হিসেবে দয়ালু। প্রার্থনাকারীর জন্য দানশীল। ক্ষমতা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল। প্রতিশোধ গ্রহণে ন্যায়পরায়ন। তাই মানযিলে মাকসাদ হিসেবে তিনি সবার কাম্য।

তিনি জানা সত্ত্বেও সহনশীল। ক্ষমতা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল। ক্ষমা তাঁর আত্মমর্যাদার জন্যে। নিষিদ্ধ হুকুম তাঁর হিকমতের কারণে। তাঁর ভালোবাসা এহসান ও রহমতের কারণে। সুমহান সেই পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর ইবাদত থেকে গাফেল নন। ইবাদতকারী থেকে গাফেল নন।

আরাফায় সালফে সালেহীন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, একবার আমি আরাফায় অবস্থান করছিলাম। আমি একটি মসৃণ পাথরে আরোহন করছিলাম। হঠাৎ এক লোককে দেখলাম হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসা। তার দুই চোখ থেকে অনবরত অশ্রু ঝরছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি সুফিয়ান সাওরী। যখন এতে নিশ্চিত হলাম যে, তিনিই সুফিয়ান তখন আমিও কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি চোখ মুছতে মুছতে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন? আমি কী জবাব দিব! উল্টো তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হযরত! এই বিশাল সমাবেশের মাঝে কার অবস্থা সবচে' শোচনীয়? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তির ধারণা হচ্ছে, তাকে এখনো ক্ষমা করা হয়নি, তার অবস্থাই সবচে' শোচনীয়।

হযরত ইসহাক বিন ইবরাহীম বলেন, আমি বিখ্যাত বুযুর্গ ফুযাইল বিন আয়াযের সাথে আরাফায় উকুফ করেছি, কিন্তু তাঁকে কোনো দুআ করতে শুনিনি। তিনি স্বীয় হাত গালে দিয়ে মৃদু স্বরে হালকা কান্না করছিলেন। ইমামের আলোচনার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থাই অপরিবর্তিত রইল। এরপর তিনি আকাশের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, 'আল্লাহ কসম; যদিও তুমি ক্ষমা কর, তারপরও গোনাহ তো আমার থেকে হয়েই গেছে। কাজেই আমার কত দুর্ভোগ!' এ কথাটা তিনি তিনবার বললেন।

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, আমি আরাফায় এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম 'বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন স্বরে লোকেদের অজস্র প্রয়োজন ও নিবেদনে আমি বিস্মিত। তোমার কাছে আমার এই মিনতি, যখন দুনিয়াবাসী সকলে আমায় ভুলে যাবে সে বিপদের সময় তুমি আমায় স্মরণ রেখ।'

তারা আরাফায় বিনশ্রুতিতে কান্না করতেন। সেখানে সালেহীনের কলব কেন বিগলিত হবে না! পাথর নিক্ষেপের স্থানে কেন তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরবে না! কেন এহরাম ও কুরবানীর সময় তাদের হৃদয় প্রেমাবেগে উদ্বেলিত হবে না! মসজিদে হারামের যিয়ারতে তাদের মনপ্রাণ কেন উল্লসিত হবে না! অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বাণী তারা শুনেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ‘ইসলাম তার পূর্ববর্তী সব কিছুকে শেষ করে দেয়। হিজ্রত তার পূর্ববর্তী সব কিছুকে নিঃশেষ করে দেয় এবং হজ্জ তার পূর্ববর্তী সব কিছুকে নিঃশেষ করে দেয়।’

হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, ‘আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। এরপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এরপর মাকবুল হজ্জ করা।’

হাজী ও ওমরাকারীরা আল্লাহর দল। তারা চাইলে তিনি তাদের দান করেন। তারা ডাকলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা করেন। তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। অথচ তা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আরাফার ভূমিতে অবস্থানরত হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করতে থাকেন এবং উচ্ছসিত হয়ে ঘোষণা করেন, ‘তোমরা এখান থেকে এমন অবস্থায় ফিরে যাও, যখন তোমাদের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘মুসলমান যখন তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার আশপাশের পাথর, বৃক্ষ, মাটি সব কিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। সে সময় যমীনগুলো ভাগ ভাগ হয়ে পড়ে।’

তিনি আরো ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য আফসোস করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই যে বান্দার দেহকে আমি সুস্থ রেখেছি, জীবনযাপনে স্বচ্ছলতা দিয়েছি, অথচ পাঁচ বছর পেরিয়ে যায় কিন্তু সে আমার কাছে এহরামের বেশে আসে না!’

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যখন মসজিদে হারামে উদ্দেশ্যে তোমার বাড়ি থেকে বের হবে তোমরা সওয়ারীর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য একটি নেকী লিখে থাকেন। একটি গোনাহ ক্ষমা করেন। আর তুমি যখন আরাফায় অবস্থান কর তখন আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন আর ফেরেশতাদের সাথে তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে থাকেন। তাদের বলেন, 'এরা আমার বান্দা। আমার বান্দা আমার কাছে এসেছে দূর-দূরান্ত থেকে এলোমেলো কেশে, ধুলোয় ধুসোরিত হয়ে। তারা আমার রহমত কামনা করে। আমার আযাবকে ভয় করে। অথচ তারা আমায় দেখেনি। কেমন হত যদি তারা আমায় দেখত!'

যদি কারো গোনাহ প্রবাহমান বালুকণা, সমুদ্রের জলবিন্দু কিংবা আকাশের বৃষ্টিফোটার সমানও হয়; আল্লাহ তাআলা তাও ধুয়ে দিবেন। পাথর নিক্ষেপ আপনার সঞ্চয় হবে। আর চুল মুগুনোয় প্রতি চুলের পরিবর্তে একটি করে নেকী আমলনামায় লিখে দেয়া হবে। এরপর আপনি যদি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন, তাহলে আপনার গোনাহসমূহ এমন ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে যেন সদ্য প্রসূত সন্তান।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তদ্বীয়া রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, কবুল হজ্জ।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেন, না। সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে, কবুল হজ্জ। হাদীসের ভাষ্যানুসারে কবুল হজ্জের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আর কবুল হজ্জ হচ্ছে, যে হজে হজ্জের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। হজ্জের উদ্দেশ্য কী? পাথর মারা, আরাফায় অবস্থান করা, মুযদালিফায় রাত কাটানো, বাইতুল্লাহর তওয়াফের উদ্দেশ্য কী? হজ্জের দাবী কী?

হজ্জের মাকসাদ ও চেতনা

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! একটু খেয়াল করি, আল্লাহ তাআলা সূরা হজ্জ কী দ্বারা শুরু করলেন? তিনি কি বলেছেন যে, লোকেরা! তোমরা হজ্জ কর? নাকি পাথর মারতে বা আরাফায় অবস্থান করতে বলেছেন? কোনোটিই নয়, বরং তিনি সেই মহান লক্ষ্য ও প্রধান ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ইরশাদ করেছেন, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ** হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন খুব ভীষণ ব্যাপার। [সূরা হজ্জ- ১]

লن َيَنَالُ اللَّهُ হাদীর যবেহ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি ইরশাদ করেছেন, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে ওই পশুর গোশত বা রক্ত কিছুই পৌছে না। আশ্চর্য! তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে কী পৌছে? **وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ** ইরশাদ হচ্ছে, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ** অর্থাৎ বরং তোমাদের তাকওয়াই তাঁর কাছে পৌছে। এভাবেই তিনি কুরবানীর পশুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তিনি যে তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর। সুতরাং আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন। [সূরা হজ্জ- ৩৭]

তাকওয়ার অর্থ কী? তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহর ভয়। কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে আমল। অল্পে তুষ্টি এবং আখেরাতের প্রস্তুতি।

হাজী সাহেবগণ কী তাকওয়া অর্জন করে থাকেন? প্রতি বছর কত লক্ষ, মিলিয়ন মানুষ হজ্জ পালন করছেন। এত বিপুল সংখ্যক লোক আরাফায় উপস্থিত হয়ে প্রতি বছর আল্লাহর কাছে তওবা ও দ্বীনের ওপর অটল থাকার অঙ্গীকার করছেন, কিন্তু হজ্জের পর সেই তাকওয়া কি থাকছে?

আজ যদি প্রত্যেক হাজী সাহেব চাই তিনি পুরুষ হোন বা মহিলা; হজ্জের কাজ্জিত উদ্দেশ্য তাকওয়া অবলম্বন করতেন এবং দ্বীনের ওপর অটল থাকার সংকল্প করতেন তাহলে দুনিয়ার চিত্র পাল্টে যেত, পরিবেশ সুন্দর হত এবং দ্বীনের শান সমুন্নত হত। তাকওয়া যদি অর্জিত হত তাহলে হজ্জের আগে

যিনি ধূমপান করতেন হজ্জের পর তিনি ধূমপান ছেড়ে দিতেন। আগে যিনি সুদ খেতেন হজ্জের পর তা বর্জন করতেন। হালাল জীবিকা তালাশ করতেন। অশ্লীলতা ও প্রবৃত্তির পূজারী নফসে আশ্রয় গোলামীকে পরিত্যাগ করতেন। নজরের হিফাজত করতেন। জামা টাখনুর উপর উঠিয়ে নিতেন। দাড়ি রেখে দিতেন। নিজের অন্তরাত্মাকে পবিত্র করতেন। এমন যদি হত তাহলেই হজ্জ স্বার্থক হত।

হজ্জের মাধ্যমে হাজী সাহেবের চিন্তা চেতনায় যদি পরিবর্তন সূচিত হত তাহলে হজ্জ থেকে ফিরে তিনি কী করতেন? তাঁর একমাত্র ধ্যান-ধারণা হত দ্বীনের খেদমত। পিতা তার ঘর ও সন্তানদের সংশোধন করতেন। চাকুরীজীবী তার অফিস ও সহকর্মীদের সংশোধন করতেন। শিক্ষক তার প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের সংশোধন করতেন। ব্যবসায়ী তার দোকান ও কর্মচারীদের সংশোধন করতেন। সকলেই দ্বীনের খাদেম হয়ে যেতেন। মানুষকে তার রবের দিকে ধাবিত করতেন। মানুষের কলবে তাকওয়ার বীজ বপন করতেন।

সাহাবায়ে কেরামের ও তাবেয়ীদের জীবনী অধ্যয়ন করুন! যারা তাদের রবের সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। হযরত তাউস বিন কাইসান বলেন, আমি মক্কায় থাকাবস্থায় হাজ্জাজ আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি তার কাছে গেলে আমাকে সে তার পাশে বসাল। একটি বালিশে আমাকে হেলান দেয়ার ব্যবস্থা করল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠরত শোনা গেল। যে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করছিল আর বলছিল, 'আমার এক ব্যক্তির সন্ধান প্রয়োজন।'

হাজ্জাজের আদেশে ওই ব্যক্তিকে ডেকে আনা হল। হাজ্জাজ তাকে প্রশ্ন করল, কে সেই ব্যক্তি? সে জবাব দিল, একজন মুসলমান।

বলা হল, তোমাকে মুসলামন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করিনি।

সে বলল, তাহলে কী বিষয়ে প্রশ্ন করেছ?

হাজ্জাজ বলল, তার দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি।

সে বলল, ইয়ামেনের অধিবাসী।

হাজ্জাজ প্রশ্ন করল, ইয়ামেনের গভর্ণর মুহাম্মাদ বিন ইউসুফকে কী অবস্থায় রেখে এসেছ?

সে বলল, তাকে সম্মানিত, বিশাল দেহের অধিকারী, কাপড় পরিহিত, আরোহী, আগমনকারী ও প্রস্থানকারী রূপে রেখে এসেছি।

হাজ্জাজ বলল, তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি।

সে বলল, তাহলে কী বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ?

হাজ্জাজ বলল, তার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।

সে জবাব দিল, তাকে অন্যায়কারী, জালেম, মাখলুকের অনুগত আর খালেকের অবাধ্য অবস্থায় রেখে এসেছি।

আগন্তকের দুঃসাহস এবং হাজ্জাজের ভাই সম্পর্কে আগন্তকের স্পর্ধা দেখে হাজ্জাজ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলল, আমার কাছে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের অবস্থান কী জানা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে আমার সামনে এমন দুঃসাহসী কথা বলতে বাধ্য বা উৎসাহিত করল?

লোকটি জবাব দিল, ‘হে হাজ্জাজ! তুমি কি খেয়াল করেছ তোমার কাছে তার অবস্থানের চেয়ে আমার কাছে আল্লাহর অবস্থান অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ? আমি তাঁর ঘরের মুসাফির। তাঁর নবীকে আমি বিশ্বাস করি। ব্যস এটুকুই।’

আগন্তকের বক্তব্য শুনে হাজ্জাজ নিশ্চুপ হয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। কোনো জবাবই সে দিতে পারল না। এদিকে অনুমতি ছাড়াই সেই ব্যক্তি হাজ্জাজের দরবার থেকে প্রস্থান করল।

তাঁর বলেন, আমি লোকটির দীনদারী ও বাহাদুরী দেখে খুবই বিস্মিত হলাম। ফলে তার সম্পর্কে জানতে আমি তার পিছু নিলাম। মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই তিনি কোনো বিদ্যান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হবেন।

সে বাইতুল্লায় এল। দুআ করল, ‘হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার দয়া কামনা করি। কৃপণদের বাধা থেকে তোমার সন্তোষ কামনা করি। ধনীদের সম্পদ থেকে অভাবমুক্ততা কামনা করি। হে আল্লাহ! তোমার দান অবিনশ্বর। তোমার উদারতা নিকটবর্তী। তোমার প্রকৃতি কল্যাণময়।’

এরপর সে মানুষের মাঝে ঢুকে পড়ল। এরপর সন্ধ্যায় তাকে আরাফায় পেলাম। তখন সে দুআ করছিল, ‘হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার হজ্জ, কষ্ট ও মোজাহাদাকে কবুল নাই কর, তাহলে অন্তত তুমি আমায় কবুল না করার মসীবতের বিনিময় থেকে বঞ্চিত কর না।’

এরপর সে আবার মানুষের ভীড়ে ঢুকে পড়ল। আমি তাকে ফজরের সময় মুয়দালিফায় দেখলাম। তখন সে দুআ করছে, ‘আল্লাহর কসম! যদিও তুমি ক্ষমা করে দিয়েছ, আর ক্ষমা তো তোমারই পক্ষ থেকে; তারপরও আমার দুর্ভাগ্য। কারণ আমি তো অপরাধী।’ বারবার সে এই দুআ করছিল।

হজ্জের প্রস্তুতি

এ পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে হজ্জ ও ওমরার বৈশিষ্ট্য ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

বাইতুল্লাহর হজ্জ ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থাৎ যে হজ্জের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম, তার ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ করা জরুরী। আর যে ব্যক্তি তা মানবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্ববাসী থেকেই বে-নিয়ায। [সূরা আলে ইমরান- ৯৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। ১. ‘আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল’ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. রমযানের রোযা রাখা। ৫. পথ খরচ বহনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।

তিনি আরো ইরশাদ করেন, তোমরা হজ্জের পর ওমরা কর। কারণ এ দু’টি দারিদ্রতা ও গোনাহকে দূর করে দেয় যেমন হাপর লোহা, সোনা ও রূপার

মরীচা ও ভেজালকে দূর করে দেয়। আর জান্নাতই হচ্ছে কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান। [সুনানে তিরমিযী]

কাজেই যখন কোনো ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করবে তার উচিত মজলুমকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। আমানত আমানতদাতার কাছে ফেরত দেয়া। পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দেয়া। অসিয়ত লিখে আসা। আর যে সকল হক তার আদায় করা সম্ভব হয়নি, সেগুলো আদায়ের একজন দায়িত্বশীল নির্ধারণ করা। সন্তানদের জন্য হালাল রুজি নিশ্চিত করা।

হজ্জ কখন ফরয হয়?

কোনো ব্যক্তির মাঝে নিম্নোক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া গেলে তার ওপর হজ্জ ফরয হয়। যথা :

১. মুসলমান হওয়া।
২. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া।
৩. বালেগ হওয়া।
৪. স্বাধীন হওয়া।
৫. সক্ষমতা থাকা।

যার মাঝে এ পাঁচ শর্ত পাওয়া যাবে তার জন্য দ্রুত হজ্জ আদায় করা ফরয।

সক্ষমতার অর্থ হচ্ছে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ হওয়া যাতে সে যে কোনো পন্থায় মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং হজ্জের খরচ বহনে সক্ষম হওয়া। হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সুস্থতার পাশাপাশি আর্থিক ভাবেও হজ্জ পালনে সক্ষম হওয়া জরুরী। যাদের খরচ বহন করা তার শরয়ী দায়িত্ব তাদের প্রয়োজনীয় খরচের বাইরে তার যাতায়াতের খরচ বহনে সক্ষম হতে হবে।

মহিলাদের হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য বিশেষ একটি শর্ত হচ্ছে, তার সাথে মাহরাম থাকতে হবে।

প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের ওপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। কোনো মুসলিম যদি হজ্জ বা ওমরা পালনের ইচ্ছা করেন তাহলে তার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্থান তথা মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা জরুরী। কোনো হজ্জ বা ওমরাকারীর জন্য মক্কার পথে সফর করতে হলে এহরাম ছাড়া সেই স্থানগুলো অতিক্রম করা জায়েয নেই।

হজ্জের মীকাত

হজ্জের মীকাত পাঁচটি। যথা :

১. জুল হুলাইফা। যা মক্কা থেকে প্রায় ৪০৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।
২. জুহফা। মক্কা ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত। এখন হাজীগণ রাবেগ (যা মক্কা থেকে ১৮৬ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত) থেকে হজ্জের এহরাম বেঁধে থাকেন।
৩. ইয়ালামলাম। এটি মক্কা থেকে দক্ষিণে ১২০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। বর্তমানে এ পথের হাজীগণ সা'দিয়া গ্রাম থেকে এহরাম বেঁধে থাকেন।
৪. করনুল মানাযিল। এর বর্তমান নাম আসসাইলুল কাবির। এটা তায়েফে অবস্থিত। মক্কা থেকে ৭৫ কিলোমিটারের কাছাকাছি এর অবস্থান।
৫. জাতু ইরক। একে যারিবা নামেও অভিহিত করা হয়। মক্কা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে এই পথ বন্ধ। এ পথ কেউ ব্যবহার করে না।

এই মীকাতের ভিতর যাদের অবস্থান অর্থাৎ যারা মক্কার আরো কাছে অবস্থান করছে, তারা নিজ বাড়ি থেকে হজ্জ ও ওমরার এহরাম বেঁধে বের হবেন। মক্কাবাসীগণও বাড়ি থেকে এহরাম বেঁধে বের হবেন। এহরামের জন্য তাদের মক্কার বাইরে গিয়ে নির্ধারিত মীকাত থেকে হজ্জের এহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তবে তারা ওমরার জন্য হারাম শরীফের সীমানার বাইরে নিকটবর্তী কোনো স্থান যেমন তানযীম বা আরাফা থেকে এহরাম বাঁধতে পারেন।

বিমানে আরোহী ব্যক্তির বিমানে আরোহনের পূর্বেই এহরামের পোষাক পরিধানসহ সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন। আকাশ যোগে তারা যখন মীকাতের বরাবর স্থানে পৌছবেন; তখন এহরামের নিয়ত করে নিবেন এবং বিমানেই তালবিয়া পড়তে থাকবেন। জিদা বিমানবন্দরে বিমান ল্যান্ড করা পর্যন্ত এহরামকে বিলম্বিত করা তাদের জন্য জায়েয হবে না। কারণ জিদা কোনো মীকাত নয়।

এহরাম ছাড়াই যারা মীকাত অতিক্রম করে ফেলেছেন এবং পুনরাবৃত্তি চান তাদের জন্য মীকাতে ফিরে এসে এহরাম বেঁধে তারপর পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে। যদি তা না করেন, বরং জিদা বা মীকাতের অভ্যন্তর থেকে এহরাম বেঁধে থাকেন তাহলে তার ওপর ফিদয়া দেয়া ওয়াজিব। এক্ষেত্রে ফিদয়া হচ্ছে, কুরবানী উপযোগী বকরী জবাই করে হারাম শরীফের গরীবদের মাঝে তার গোশত বণ্টন করে দেয়া। হাজী সাহেব নিজে তা থেকে কিছু খেতে পারবেন না।

এহরামের নিয়ম

হজ্জের প্রথম কাজ হচ্ছে, এহরাম বাঁধা। এহরাম হচ্ছে হজ্জের কাজ শুরু করার নিয়ত করা। একে এহরাম বলার কারণ হচ্ছে, এই নিয়তের মাধ্যমে হজ্জ বা ওমরায় ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজের ওপর আগে যা কিছু করার তার স্বাভাবিক অনুমতি ছিল (যেমন বিবাহ করা, সুগন্ধি ব্যবহার, নখ কাটা, মাথা মুগুনো, বিভিন্ন রকমের পোষাক পরিধান করা) এ জাতীয় আরো অনেক কিছুকেই নিজের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে।

এহরামের পূর্বে কয়েকটি কাজ করা মুস্তাহাব। যথা :

১. ভাল করে গোসল করা। পরিচ্ছন্ন হওয়া ও শরীরের দুর্গন্ধ দূর করা। হয়েয-নেফাসগ্রাস্তা মহিলাসহ সকলের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে উমাইসকে নেফাস চলাকালীন গোসল করতে বলেছিলেন। হযরত আয়েশাকে তাঁর হয়েয চলাকালীন হজ্জের এহরামের জন্য গোসল করতে তিনি আদেশ করেছিলেন।

২. শরীরের অবাস্তিত লোম পরিস্কার করা। যেমন গোফ, বগল ও নাভির নিচের পশম ইত্যাদি।
৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা। কারণ হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এহরাম বাঁধার পূর্বে এহরামের জন্য এবং হালাল হয়ে গেলে তওয়াফের জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।
৪. স্বাভাবিক পোষাক খুলে ফেলবে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সাদা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। তবে সাদা না পরাও জায়েয আছে।
৫. মহিলারা পোষাকে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন না করে শরীর ঢাকতে প্রয়োজনীয় যে কোনো পোষাক পরতে পারে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো রঙের বিশেষণ নেই। তবে তারা মুখের নেকাব ও হাত মোজা পরিধান করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী) তবে তারা পুরুষদের থেকে চেহারা ঢাকতে নেকাব ছাড়া অন্য কোনো কাপড় ব্যবহার করবে। কারণ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর বলেন, আমরা এহরাম অবস্থায় পুরুষদের থেকে আমাদের চেহারাকে ঢেকে রাখতাম। [মুস্তাদরাকে হাকেম]

এরপর ওমরার নিয়ত করবে এবং সে অনুসারে মুখেও বলতে পারে, ‘হে আল্লাহ! ওমরার জন্য হাযির হয়েছি।’ তবে যানবাহনে স্থির হয়ে বসার পরই ওমরার নিয়ত করা উত্তম। আর সরাসরি হজ্জের সফরে বের হন তাহলে সে অনুযায়ীই নিয়ত করবেন।

হজ্জ তিন ধরনের হতে পারে। যথা :

১. তামাত্তু হজ্জ। তা হচ্ছে, হজ্জের মাসে প্রথমে শুধু ওমরার নিয়ত করে ওমরা করা। তারপর হজ্জ করা।
২. ইফরাদ হজ্জ। এটা হচ্ছে, মীকাত থেকে কেবল হজ্জের এহরাম বেঁধে হজ্জ করা এবং হজ্জের আমল শেষ হওয়া অবধি এহরাম ধারণ করে থাকা।
৩. কিরান হজ্জ। এটা হচ্ছে, একত্রে হজ্জ ও ওমরার এহরাম বাঁধা অথবা প্রথমে ওমরার বাঁধা। তারপর তওয়াফের পূর্বেই হজ্জের সময় শুরু হয়ে গেলে ওমরার তওয়াফ করার পূর্বে মীকাত থেকে পুনরায় হজ্জ ও ওমরা

উভয়টির এহরাম বাঁধা। সে ক্ষেত্রে তওয়াফ ও সাযীতে হজ্জ ও ওমরা উভয়টির নিয়ত করবেন।

তামাত্ত ও কিরান হজ্জ আদায়কারী মসজিদের হারামের অধিবাসী না হলে হাদী জবাই করা ওয়াজিব। এ হজ্জগুলোর মধ্যে তামাত্ত হজ্জ আদায় করাই উত্তম। এর স্বপক্ষে প্রচুর দলীল রয়েছে। দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে এখানে তা পরিহার করছি। (নির্ভরযোগ্য মতানুসারে কিরান হজ্জ আদায় করাই উত্তম-অনুবাদক)

এহরাম বাঁধার নিয়ত করার পর তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখবেন। তালবিয়া হচ্ছে, **لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك** এটা বেশি বেশি পাঠ করবেন এবং পুরুষরা এটা উঁচু স্বরে পাঠ করবেন।

এহরামের জন্য দু'রাকাত বা নির্ধারিত কোনো নামায নেই। তবে কোনো ফরয নামাযের পর এহরাম বাঁধা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন। [সহীহ মুসলিম]

আগেও বলেছি বিমান যোগে যারা আসবেন সে সকল মুসাফির ভাইবোন বিমান যখন আকাশে মীকাত অতিক্রম করবে, তার আগেই আপনারা এহরাম বেঁধে নিবেন। আর অসুস্থ বা মায়ুর ব্যক্তি যারা তাদের হজ্জ বা ওমর পরিপূর্ণ করতে পারার ব্যাপারে শঙ্কিত; তারা এভাবে নিয়ত করবেন কোনো বাধার কারণে আমি যদি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তাহলে তখন থেকে আমি হালাল হয়ে যাব। এভাবে বলার উপকার হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কোনো কারণে তিনি বাধাগ্রস্ত হলে ফিদয়া ছাড়াই ওমরার এহরাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। এহরাম বাঁধার পর বেশি বেশি তালবিয়া পড়া সুন্নত। পুরুষগণ উচ্চস্বরে পড়বেন আর মহিলাগণ নিম্নস্বরে পড়বেন।

তওয়াফের নিয়ম

মসজিদে হারামে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত থাকবে। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে তালবিয়া পাঠ স্থগিত করে দিবেন। এরপর

এহরামের পোষাক থেকে ডান কাঁধ বের করে বাম কাঁধ ঢেকে দিবেন এবং ডান হাতে হাজরে আসওয়াদ হাতে ধরে মুছবেন এবং আল্লাহ আকবার বলে চুম্বন করবেন। ভীড়ের কারণে তাতে চুম্বন করতে না পারলে হাতে স্পর্শ করে ঐ হাত চুম্বন করবেন। তাও না পারলে লাঠি বা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা তা স্পর্শ করবেন এবং ঐ বস্তুতে চুম্বন করবেন। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে চুম্বনের প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে কেবল হাজরে আসওয়াদের অভিমুখী হয়ে আল্লাহ আকবার বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ডান হাত দিয়ে ইশারা করবে।

এরপর সাতবার কাবা ঘর চক্কর দিবেন। প্রতিবার হজ্বের আসওয়াদ থেকে শুরু করবেন এবং সেখানে এসেই শেষ করবেন এবং পারলে তা চুম্বন করবেন। আল্লাহ আকবার বলে তা স্পর্শ করবেন। তা সম্ভব না হলে হাতে ইশারা করবে এবং তাকবীর বলবেন। সপ্তমবার পর্যন্ত প্রতিবারই তা করবেন।

আর রুকনে ইয়ামানীর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তাকবীর বলা ছাড়া তা স্পর্শ করবেন। ভীড়ের কারণে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাত দ্বারা ইশারাও করবেন না। তাকবীরও বলবেন না, বরং স্বাভাবিক তওয়াফ অব্যাহত রাখবেন। রুকনে ইয়ামানী ও হজ্বের আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ “হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর।” [সূরা বাকারা : ২০১] এই দুআ পড়া মুস্তাহাব।

তওয়াফের জন্য বিশেষ কোনো দুআ নেই। কাজেই তওয়াফকালীন কেউ কুরআন তিলাওয়াত, বা হাদীসে বর্ণিত কোনো দুআ বা ভিন্ন কোনো যিকির বা দুআ পড়তে চাইলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

পুরুষের জন্য তওয়াফের সাত চক্করের মাঝে প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত। রমল হচ্ছে, পায়ের ধাপগুলো সংকুচিত করে দ্রুত হাটা। তওয়াফের সময় পবিত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। চক্করের পরিমাণ নিয়ে মনে সন্দেহ তৈরি হলে প্রবল ধারণা বা তুলনামূলক কম সংখ্যা ধরে নিয়ে সে অনুসারে বাকী চক্কর

পূর্ণ করবেন। যেমন তিন বা চার নিয়ে সন্দেহ হলে তিন চক্রর হয়েছে বলে বিবেচনা করবেন এবং অবশিষ্ট চক্রর পূর্ণ করবেন।

তওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীম অভিমুখী হবেন এবং তিলাওয়াত করবেন, **واخذوا من مقام إبراهيم مصلی** আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও। (সূরা বাকারা : ১২৫) এরপর তার পিছনে উভয় কাঁধ ঢেকে দু'রাকাত নামায আদায় করবে।

প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। ভীড়ের কারণে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামায আদায়ে সক্ষম না হলে হারামের যে কোনো জায়গায় তা পড়তে পারে। এরপর মুস্তাহাব হচ্ছে, যমযমের পানি পান করা এবং সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

সাফা-মারওয়ায় সায়ী

এরপর সায়ীর জন্য প্রস্তুত হবেন। প্রথমে সাফা থেকে শুরু করবেন। সায়ী শুরু করার সময় পড়বেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তায়ালায় নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তায়ালায় অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। [সূরা বাকারা- ১৫৮] এবং বলবেন, আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়ে সূচনা করলাম। সাফায় আরোহন করে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে এই দুআ পড়বেন, **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** এর সাথে যে কোনো দুআই পড়া যেতে পারে। এভাবে তিনবার উল্লিখিত দুআ পড়বে। প্রথম

দুইবার সাথে অন্য দুআ পড়বেন। কিন্তু তৃতীয় বার সাথে অন্য কোনো দুআ পড়বেন না।

এরপর মারওয়ার দিকে ছুটবেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানে সবুজাঙ্কিত জায়গায় দ্রুত দৌড়াবেন। মারওয়ায় আরোহন করে সাফা পাহাড়ে আরোহন কালীন নিয়মে কিবলামুখী হয়ে দুআ ও আমলসমূহ সম্পাদন করবে। এভাবে সাতবার দৌড়াবে। প্রতিবারই আলোচিত আমলগুলো সম্পাদন করবে। সপ্তমবারে কোনো দুআ করবে না।

সায়ীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট দুআ নেই, বরং এ সময় আল্লাহর যিকির বা অন্য যে কোনো দুআ পড়া যেতে পারে। কুরআন তিলাওয়াতও করা যেতে পারে।

পবিত্র অবস্থায় সায়ী করা মুস্তাহাব। সায়ী চলাকালীন ফরয নামায শুরু হয়ে গেলে জামাতে শরীক হয়ে যাবেন। জামাত শেষ হলে সায়ী পূর্ণ করবেন।

মাথা মুণানো বা চুল ছাটার বিধান

সায়ীর পর মাথার চুল মুণাবেন বা বা খাটো করবেন। ওমরার পর হজ্জের সময় কাছাকাছি থাকলে চুল খাটো করাই উত্তম। এতে হজ্জের সময় মাথার চুল মুণানোর সুযোগ থাকবে। তবে কেউ শুধু ওমরা করে থাকলে তার জন্য চুল মুণিয়ে ফেলাই উত্তম। চুল খাটো করলে মাথার সব চুলই খাটো করা জরুরী। এক্ষেত্রে কেবল এক দিকের কিছু চুল ছাটা যথেষ্ট হবে না।

আর মহিলা হাজী বা ওমরাকারীগণ চুলের প্রতি বেণী বা সব দিক থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ খাটো করবেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের মাথার চুল মুণানোর বিধান নেই। তাদের জন্য চুল কিছু খাটো করা জরুরী। [আবু দাউদ]

মাথার চুল মুণানো বা খাটো যাই করা হোক। এর মাধ্যমে ওমরার কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়।

হজ্জের আমলে সূচনা

এরপর হজেচ্ছুক ব্যক্তি হজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করবেন। যেদিন তারবিয়ার দিন হবে অর্থাৎ জিলহজ্জের ৮ তারিখ হবে, সেদিন হাজী সাহেব মিনা বা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন স্থায়ী অবস্থানের জায়গা থেকে পুনরায় হজ্জের এহরাম বাঁধবেন। কাজেই প্রথমে গোসল করে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন। এরপর চাশতের সময় মিনায় যাবেন। সেখানে ফজর, যোহর, আসর; মাগরিব ও এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথা সময়ে আদায় করবেন। এ ক্ষেত্রে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযগুলো দু'রাকাত আদায় করবেন। এরপর মিনাতেই রাত যাপন করবেন। নয় তারিখ তথা আরাফার দিনের সূর্য উদিত হলে আরাফার দিকে যাত্রা করবেন। যোহর এবং আসরকে একত্রে যোহরের সময় দু'রাকাত করে আদায় করবেন।

আরাফায় অবস্থান

উকুফে আরাফা তথা আরাফায় অবস্থানকালে কিবলামুখী হয়ে জাবালে আরাফা (আরাফার পাহাড়)এর পিছনে অবস্থান করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জকালীন সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আরাফার ময়দানে যে যে অবস্থাতেই থাকুক, যানবাহনে, পায়ে দাঁড়িয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, শোয়ে সর্বাবস্থাতেই খুব মোজাহাদার সাথে যিকির, দুআ ও এস্তেগফারে মশগুল থাকবেন। এক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত ব্যাপকার্থবোধক দোয়াসমূহ পড়তে পারলে ভাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম দুআ হচ্ছে, আরাফার দুআ। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদের মুখের সর্বোত্তম দুআ ও যিকির হচ্ছে, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير [সুনানে তিরমিযী]

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবেন। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে প্রস্থান করা জায়েয হবে না। যদি কেউ তার পূর্বেই সেখানে থেকে চলে আসেন তাহলে আবার ফিরে যাবেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। ফিরে না গেলে তার জন্য ফিদয়া দেয়া ওয়াজিব। কারণ তিনি ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছেন।

আরাফায় অবস্থানের সময়ের সূচনা হচ্ছে, আরাফার দিন যোহরের সময় থেকে। দশ তারিখ ফজর পর্যন্ত এখানে অবস্থানের সুযোগ থাকে। যে ব্যক্তি দিনের বেলা আরাফায় অবস্থান করবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার সেখানে অবস্থান করা জরুরী। আর যে রাতে অবস্থান করল। হোক তা সামান্য সময়ের জন্য; তাহলেও তার হজ্জ সহীহ হয়ে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে রাতের বেলা আরাফা পেল সেও হজ্জ পেল।’

আরাফায় ওকুফ (অবস্থান) করা হজ্জের সবচেয়ে বৃহত্ত্ব রুকন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হজ্জ হচ্ছে আরাফা। সূর্যাস্তের পর হাজীগণ আরাফা থেকে মুযদালিফায় চলে আসবেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করতেন। এরপর উটনীর জন্য গলায় এমন ভাবে রশি লাগাতেন যে, উটনীর মাথা পা রাখার স্থানকে ছুঁতে পারে এবং তিনি রাস্তায় বেশি বেশি তালবিয়া ও এস্তেগফার পড়তেন।

মুযদালিফায় রাতযাপন

মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাযের সময় একত্রে এক আজান ও ভিন্ন ভিন্ন ইকামাতের মাধ্যমে আদায় করবেন। এক্ষেত্রে এশার নামায দু’রাকাত আদায় করবেন। মুযদালিফায় পৌঁছে কালবিলম্ব না করে প্রথমেই নামায আদায় করবেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তারা যদি অর্ধরাত্রির পূর্বে পৌঁছতে না পারেন, তাহলে নামায সময় শেষ হয়ে যেতে পারে; বিধায় পথেই মাগরিব ও এশা আদায় করে নিবেন।

তারপর মুযদালিফায় রাত কাটাবেন। সেখানে ফজরের প্রথম প্রহরে ফজর আদায় করবেন। এরপর আলো ফোটা পর্যন্ত দুআয় কাটাবেন। তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনায় চলে আসবেন। তবে মহিলা, শিশু বা মাযুর থাকলে তারা চাইলে অর্ধ রাত্রির পরই মুযদালিফা থেকে মিনায় চলে আসা জায়েয আছে। তাদের একান্ত সফরসঙ্গীদের জন্যও তাদের সঙ্গী বা সেবক হিসেবে একত্রে চলে যাওয়ার সুযোগ আছে।

তবে সামর্থবান ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের জন্য ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। ফজর আদায় করে আকাশ আলোকিত হওয়া পর্যন্ত বেশি বেশি যিকির ও দুআ করবেন। তারপর তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার পথে রওনা হবেন।

মুযদালিফায় রাত কাটানো হজ্জের অন্যতম একটি ওয়াজিব। মাঝ রাতের পূর্বেই যিনি সেখানে পৌছবেন তার জন্য সেখানে রাত কাটানো বর্জন করা জায়েয হবে না। তবে যিনি অর্ধরাতের পর সেখানে পৌছবেন তার জন্যও সেখানে সামান্য সময় হলেও অবস্থান করা দরকার। তবে উত্তম হচ্ছে, ফজরের নামায পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা। অবশ্য মায়ুর ব্যক্তি জন্য ও চিকিৎসাযোগ্য রোগীদের জন্য মুযদালিফায় রাত না কাটানোর অবকাশ রয়েছে।

মুযদালিফার রাতের পরবর্তী সকালে অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন ফজরের আযানের পরক্ষণেই সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা থেকে মিনায় চলে আসবেন।

শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ

মিনায় পৌছার পূর্বেই পশ্চিমধ্যে প্রতীকি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের জন্য পাথরের কঙ্কর সংগ্রহ করবেন। এটাই উত্তম। তবে মুযদালিফা বা মিনা থেকে সংগ্রহ করাও জায়েয আছে। পাথরের কঙ্কর নখের পরিমাণ হওয়া; ছোলা দানার চেয়ে একটু বড় হওয়া চাই।

এরপর জামরায়ে আকাবাহ যাকে প্রধান বা বৃহত্তর জামরা বলা হয় সেখানে যাবেন। সেখানে সূর্যোদয়ের পর একটি একটি করে সাতটি পাথরে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। পাথর নিক্ষেপের স্বাভাবিক সময় সূর্যাস্ত পর্যন্তই। অবশ্য রাতে নিক্ষেপ করাও জায়েয আছে। পাথর নিক্ষেপের সর্বশেষ সময় এগার তারিখ ফজর পর্যন্ত। পাথরগুলো নিক্ষেপের পর তা জামরার হাউযে পড়া জরুরী। এরপর সেখানে স্থির থাকুক বা সেখানে থেকে ছিটকে যাক, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

কাজেই হাজীর ওপর জামরার হাউয়ে পাথর ফেলা ওয়াজিব। দীর্ঘ পিলারের গায়ে তা লাগা বিবেচ্য বিষয় নয়। ঐ পিলারগুলো পাথর নিক্ষেপের জন্য নির্মিত হয়নি। সেগুলো নিছক শয়তানকে পাথর মারার জায়গা চিহ্নিত করার সুবিধার্থে নির্মিত হয়েছে। সুতরাং যদি ঐ পিলারে পাথর নিক্ষেপ করে। আর তা তার গায়ে লেগে ছিটকে বাইরে পড়ে যায়, হাউয়ে না পড়ে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে যদি পিলারে পাথরে নিক্ষেপ করা হয়, আর তা সরাসরি হাউয়ে গিয়ে পড়ে, কিন্তু তা থেকে তা গড়িয়ে বাইরে পড়ে যায়। তাহলে তা যথার্থ বলে গণ্য হবে।

দুর্বল ব্যক্তিগণ মুযদালিফার অর্ধ রাতের পরও পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন। এ সময় অন্যরা নিক্ষেপ করলেও তা জায়েয রূপে গণ্য হবে। কিন্তু তাদের জন্য তা করা অনুত্তম।

মিনায় পৌছার পর জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পূর্বে হজ্জের অন্য কোনো কাজ না করা সুন্নত। কারণ এটা মিনার প্রথম কাজ। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা মুস্তাহাব। এ সময় এই দুআ পড়বে-

اللهم اجعله حجاجميرورا وذنباً مغفوراً.

কুরবানীর দিনগুলোতে জামরায়ে আকাবা তথা বড় জামরা ছাড়া অন্য কোনো জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে না।

কুরবানী

পাথর নিক্ষেপের পর হাজী সাহেব হজ্জে তামাত্ত বা কিরান পালন করে থাকলে হাদী (কুরবানীর পশু) কুরবানী করবেন। এ পশুর গোশত তিনি নিজেও খেতে পারবেন। কাউকে তা হাদিয়া বা দানও করতে পারবেন। জিলহজ্জের তের তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্তই পশু কুরবানীর সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যবর্তী সময়ের রাতগুলোতেও কুরবানী করা জায়েয। কিন্তু উত্তম হচ্ছে ঈদের দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পর কুরবানী করতে বিলম্ব না করা। দ্রুতই কুরবানী করে ফেলা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন। আর দরিদ্র হাজী যার হাদী সংগ্রহের সামর্থ নেই

তিনি দশ দিন রোযা রাখবেন। এক্ষেত্রে ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ ও দেশে ফিরে বাকী সাত রোযা রাখা মুস্তাহাব।

মাথা মুণ্ডনো

এরপর হাজী সাহেব মাথা মুণ্ডাবেন বা চুল খাটো করবেন। তবে মুণ্ডানোই উত্তম। কারণ আল্লাহ তাআলা মুণ্ডানোর কথা আগে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ.

অর্থাৎ মাথা মুণ্ডিত ও চুল খাটো অবস্থায়। [সূরা ফাতাহ- ২৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার আর খাটোকারীদের জন্য একবার দুআ করেছেন।

খাটো করলে পূর্ণ মাথার চুলই খাটো করবেন। কিছু চুল বা কোনো এই দিক খাটো করলে তা যথার্থ হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে সমস্ত মাথা মুণ্ডানোর কথা বলেছেন। কিছু অংশের বিষয়ে বলেননি। ঘোষিত হয়েছে-

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ.

অর্থাৎ তাদের মাথাগুলো মুণ্ডিত ও চুল খাটো করা। [সূরা ফাতাহ- ২৭]

টাক মাথা বা যার মাথায় চুল নেই, তিনি মাথার উপর ক্ষুর ঘুরাবেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করি, তখন তোমরা সাধ্যানুসারে তা পালন কর।’

মহিলাগণ তাদের চুলের বেণীর আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ খাটো করবেন। চুল বেণীকৃত না হলে চুল ধরে সবদিকের চুল থেকে এ পরিমাণ খাটো করবেন।

জামরায় পাথর নিক্ষেপ ও মাথার চুল মুণ্ডন বা খাটো করার পর এহরাম বাঁধা ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, সব ধরনের পোষাক পরিধানসহ অন্যান্য সব কিছুই হালাল হয়ে যায়। কেবল স্ত্রী সম্বোগই তখনো হারাম থেকে যায়। এটা হচ্ছে, হালাল হওয়ার প্রথম ধাপ।

তওয়াফে যিয়ারাত ও সায়ী

মাথা মুণ্ডানো ও পাথর নিক্ষেপের পর হাজী সাহেব পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করে হারামে গমন করবেন এবং তওয়াফ আদায় করবেন। এই তওয়াফকে তওয়াফে ইফাযা (বা তওয়াফে যিয়ারাত) বলা হয়। এ তওয়াফের কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা নির্দেশ-

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

অর্থাৎ এরপর তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণ করে। আর সেই নিরাপদ ঘরের তাওয়াফ করে। [সূরা হজ্জ : ২৯]

এছাড়াও হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফ করার আগে তাঁকে হালাল হিসেবে বরণ করার জন্য আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম।’

এরপর হজ্জের জন্য সায়ী করবেন। এ তওয়াফের পর এহরামের কারণে হাজী সাহেবের ওপর যা কিছু হারাম হয়ে গিয়েছিল; তার সবই হালাল হয়ে যায়। এমনকি স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে যায়। এটা হচ্ছে হালালের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ।

উত্তম হচ্ছে, পাথর নিক্ষেপ, মাথার চুল মুণ্ডন বা খাটোকরণ ও তওয়াফের মাঝে ক্রমধারা রক্ষা করা। প্রথমে পাথর নিক্ষেপ। তারপর মাথার চুল মুণ্ডন বা খাটোকরণ। এরপর তওয়াফ। কিন্তু কেউ যদি এ ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে, তাতেও কোনো গোনাহ নেই। সে ক্ষেত্রে এ তিনটি কাজের যে কোনো দু’টি সম্পাদন করার মাধ্যমে হালালের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হবে। আর তৃতীয়টি সম্পাদন করার মাধ্যমে হালালের চূড়ান্ত ধাপ সম্পন্ন হবে।

এই তওয়াফ ও তৎপরবর্তী সায়ীর বৈশিষ্ট্য তাই যা উমরার তওয়াফ ও সায়ীর বেলায় আলোচনা হয়েছে।

তওয়াফে ইফাযার পর ঈদের দিনই মিনায় চলে আসবেন। এদিন এখানে রাত কাটানো ওয়াজিব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐদিন একমাত্র আব্বাস রাযি. ছাড়া আর কাউকে মক্কায় রাত কাটানোর অনুমতি দেননি। আব্বাসকে অনুমতি দিয়েছিলেন বিশেষ ওয়রের কারণে। কারণ তাঁর ওপর হাজী সাহেবদের পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল। (ইবনে মাযাহ)

মিনায় তিন রাত অর্থাৎ জিলহজ্জের ১০, ১১ ও ১২ তারিখের রাত কাটাতে হবে। এ সময় মিনাতেই সব ওয়াক্তের নামায তার যথাসময়ে আদায় করবেন। তবে চার রাকাতের নামাযগুলো দু'রাকাত আদায় করবেন এবং পরবর্তী আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিন (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর (দ্বি-প্রহরের পর) যোহরের আযান হয়ে গেলে সবগুলো জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করবেন। কারণ হযরত ইবনে ওমর রাযি. বলেন, আমরা অপেক্ষা করতাম। যখন সূর্য হেলে পড়ত তখন পাথর নিক্ষেপ করতাম। [বুখারী]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা আমার থেকে হজ্জের কার্যাবলী শেখ।'

সুতরাং ১১ তারিখ বা তার পরবর্তী দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু হবে দ্বি-প্রহরের পর। তার আগে পাথর নিক্ষেপ সহীহও নয়। জায়েযও নয়। নামায যেমন সময়ের আগে জায়েয নেই তদ্রূপ পাথর নিক্ষেপও তার সময়ের আগে জায়েয হবে না।

(সমকালীন ও পূর্ববর্তী কোনো উলামায়ে কেরাম দ্বি-প্রহরের পূর্বেও পাথর নিক্ষেপ জায়েয হওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বি-প্রহরের পর পাথর নিক্ষেপ করেছেন। এটা যথার্থ। কিন্তু তিনি তো তার পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেননি। আর সাধারণত তাকে হজ্জের কোনো কাজ আগ-পিছ হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, ঠিক আছে, কর। সমস্যা নেই। তাছাড়া এ ছাড় ও অনুমতি মানুষের জন্য বিশেষত বর্তমানে যে পরিমাণ

ভীড় হয় তার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ও উপযোগী। আর হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর বর্ণনা কেবলই একটি ঘটনার বিবরণ। তা পূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দেয়ার উপযুক্ত দলীল হতে পারে না।)

তবে উত্তম এটাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার থেকে হজ্জের কার্যাবলী শেখ। আর তিনি তো দ্বি-প্রহরের পরই পাথর নিক্ষেপ করেছেন। দশ তারিখের পর পাথর মারার সময় প্রথমে ছোট জামরা, তারপর মাঝারী জামরা, এরপর বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি জামরায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন।

ছোট জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দীর্ঘ দুআ করা সুন্নত। মাঝারী জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর জামরাকে ডানে রেখে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করবেন। আর বড় জামরায় কেবল পাথর নিক্ষেপ করবেন। সেখানে দাঁড়িয়ে কোনো দুআ করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর আমল এমনই ছিল। (বুখারী)

অসুস্থ, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলা ও দুর্বল ব্যক্তির পাথর মারার জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে কাউকে দায়িত্বশীল বানাতে পারবেন। দায়িত্বশীল প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে তারপর দায়িত্বদাতার পক্ষ থেকে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবেন।

১২ তারিখে জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর হাজী সাহেব চাইলে মাগরিবের আগে ফিরেও আসতে পারেন আর চাইলে রাতে মিনাতেই থেকে ১৩ তারিখে পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন। তবে ১২ তারিখ রাতে মিনায় থেকে ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপ করে তারপরই মিনা ত্যাগ করা উত্তম। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে, তার জন্য কোনো গোনাহ নেই। আর যে বিলম্ব করে, তারও কোনো গোনাহ নেই; এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে। [সূরা বাকারা- ২০৩]

মিনা থেকে ১২তারিখ বের হওয়ার পূর্বেই সূর্যাস্ত হয়ে গেলে মিনায় বিলম্ব করাই জরুরী। কাজেই সে ক্ষেত্রে মিনায় রাত যাপন করে ১৩তারিখে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবেন।

হাজী সাহেব হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করার পর যখন স্বদেশে ফিরে যাওয়ার বা অন্য কোথাও যাওয়ার সংকল্প করবেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা জরুরী। কারণ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তাদের শেষ কাজ হয় বাইতুল্লাহ সংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে। তবে হায়েযা মহিলা হলে ভিন্ন কথা।' [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] কাজেই হায়েযা মহিলা বিদায়ী তাওয়াফ করবেন না।

হজ্জ ও ওমরার বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি। কথা শেষ করার আগে আমি আমার ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কথা বলতে চাচ্ছি।

বাচ্চাদের হজ্জ

নাবালেগ বাচ্চারা নফল হজ্জ বা ওমরা করতে পারে। কারণ একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে এক বাচ্চা ছেলে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরও কি হজ্জ হবে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, হবে এবং তুমিও তার হজ্জের সওয়াব পাবে। [সহীহ মুসলিম]

এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত রয়েছে যে নাবালেগ যদি হজ্জ আদায় করে তাহলে বালেগ হওয়ার পর সে হজ্জ আদায়ে সক্ষম থাকলে পুনরায় হজ্জ আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব। নাবালেগ অবস্থায় কৃত হজ্জ তার ফরয হজ্জের বিকল্প বিবেচিত হবে না। ওমরার হুকুমও একই।

নাবালেগের এহরাম : নাবালেগ যদি একেবারে অবুঝ হয় যে এহরামের অর্থই বুঝে না। তার অভিভাবক এক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে এহরামের নিয়তে তাকে এহরাম বেঁধে দিবে। তার পক্ষ থেকে এহরামের নিয়ত করবে। তাকে নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত রাখবে। তাকে নিয়ে সায়ী ও তাওয়াফ সম্পন্ন

করবে। আরাফা, মিনা, মুযদালিফায় তার সাথে থাকবে। তার পক্ষ থেকে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে।

পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি বুঝমান হয় তাহলে সে তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে নিজেই নিজের এহরামের নিয়ত করবে। আর যদুর সম্ভব সে নিজেই স্বীয় হজ্জের কার্যাদি সম্পন্ন করবে। আর যে সব কাজ তার দ্বারা করা সম্ভব নয়, সেগুলো যদি এমন কাজ হয়; যাতে প্রতিনিধিত্ব কার্যকর যেমন জামরায় পাথর নিক্ষেপ; এগুলো তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সম্পন্ন করবে। আর তিনি তাকে সাথে নিয়ে তাকে তওয়াফ ও সাযী করাবেন। সে চলতে না পারলে তাকে বাহনে আরোহন করিয়ে বা কোলে করেও তা করা যাবে। আর যে সব কাজ বাচ্চা নিজেই করতে পারে যেমন আরাফায় অবস্থান, মিনায় রাত কাটানো; এসব তাকেই করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই; বিধায় অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করলে তা সহীহ হবে না। এক্ষেত্রে বাচ্চার জন্যও সেই সব কার্যাদি নিষিদ্ধ যা বড়দের বেলায় প্রযোজ্য।

মহিলাদের হজ্জের বিধান

হজ্জ বা অন্য কোনো সফর মহিলাদের জন্য মাহরাম ছাড়া করা জায়েয নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মহিলারা যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে। মাহরাম ছাড়া কোনো পুরুষ যেন তার কাছে না আসে।' [বিশুদ্ধ সূত্রে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত]

এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার স্ত্রী হজ্জের জন্য বের হয়েছে। আর আমি অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লেখিয়েছি। এখন কী করণীয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি স্ত্রীর কাছে চলে যাও। তার সাথে হজ্জ আদায় কর। [বুখারী, মুসলিম]

সহীহ ও সুনানের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, কোনো মহিলার জন্য এক দিন এক রাতের দূরত্বে মাহরাম ছাড়া সফর করা হালাল নয়।

আর মহিলার মাহরাম হচ্ছে, তার স্বামী এবং ঐ সকল আত্মীয় যাদের সাথে তার বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম। হারামের কারণ বংশীয় সূত্রেও হতে পারে যেমন ভাই, পিতা, চাচা, ভতিজা, মামা। আবার তা কোনো বৈধ কারণও হতে পারে যেমন দুধ ভাই। আবার বৈবাহিক সূত্রের কারণেও হতে পারে যেমন মায়ের স্বামী, স্বামীর ছেলে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে হজ্জের সফরে ঐ মাহরামের ব্যয়ভার মহিলা বহন করতে পারলেই তার ওপর হজ্জ ফরয হবে। কাজেই মহিলাদের হজ্জ আদায় ঐ সময় ফরয হবে যখন সে তার নিজের ও তার মাহরামের হজ্জের সফরে আসা-যাওয়ার ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হবে।

এহরামের আগেই যদি কোনো মহিলা হয়েয বা নেফাসগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তারপর অপবিত্র অবস্থায় তিনি এহরাম বাঁধেন কিংবা পবিত্র অবস্থাতেই তিনি এহরাম বেঁধেছিলেন, কিন্তু এহরাম বাঁধা অবস্থাতে তার হয়েয বা নেফাস চলে আসল তাহলে তিনি এহরাম বাঁধা অবস্থাতেই থাকবেন এবং হজ্জের কার্যাদি যেমন আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত কাটানো, জামরায় পাথর মারা, মিনায় রাত কাটানো; এসব তিনি সম্পাদন করবেন। এ সময় তিনি কেবল বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও তৎ পরবর্তী সাফা-মারওয়ায় সায়ী থেকে বিরত থাকবেন। তবে তিনি যদি পবিত্র অবস্থায় তওয়াফ শুরু করে থাকেন, আর তওয়াফ চলাকালীন তার হয়েয চলে আসে তাহলে তওয়াফ স্থগিত করে দিবেন। এক্ষেত্রে তিনি হয়েয অবস্থাতেই সায়ী করতে পারবেন। কারণ সায়ীর জন্য পবিত্রতা জরুরী নয়।

হজ্জ চলাকালীন যেন মাসিক চলে না আসে; এতদুদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য বডি/ট্যাবলেট খেয়ে তার মাসিক বন্ধ রাখা জায়েয হবে।

বদলী হজ্জ

কোনো ব্যক্তি যদি আর্থিকভাবে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শারিরীকভাবে হজ্জ আদায়ে অক্ষম হন যেমন অতিবৃদ্ধ বা এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যা থেকে সুস্থতার সম্ভবনা নেই; তাহলে তার জন্য কাউকে দিয়ে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ ও ওমরা আদায় করানো জরুরী। কারণ খাসআমের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া

বদলী হজ্ব আদায়ের জন্য আদায়কারী আগে নিজের ফরয হজ্ব করে থাকতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন; সে বলছে, ‘শিবরিমার পক্ষ থেকে লাক্বাইক।’ তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজের হজ্ব আদায় করেছ? সে জবাব দিল, না, করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি প্রথমে নিজের হজ্ব আদায় কর। তারপর শিবরিমার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর। [বায়হাকী কর্তৃক বিশুদ্ধ সাব্যস্তকৃত]

প্রতিনিধি তার নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে এহরামের নিয়ত করবে। তার পক্ষ থেকেই তালবিয়া পাঠ করবে। এ ক্ষেত্রে মনে মনে নিয়ত থাকাই যথেষ্ট। মুখে ঐ ব্যক্তির নাম নেয়া জরুরী নয়।

Scanned with CamScanner

এহরামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী

এহরামের কারণে যে সব কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক সেসবই হচ্ছে এহরামের নিষিদ্ধ কার্যাবলী। এমন কাজ নয়টি। যথা :

১. একান্ত ওয়র ছাড়া দেহের কোনো লোম বা চুল ছেড়া বা উপড়ানো।
২. নখ কাটা। তবে নখ ভেঙ্গে গেলে তা ফেলে দেয়া জায়েয।
৩. পুরুষদের জন্য টুপি ইত্যাদি দিয়ে মাথা ঢাকা। তবে ছাতা, গাছ বা কোনো ছাদের ছায়া গ্রহণ করা জায়েয।
৪. পুরুষের জন্য সেলাই করা জামা বা পায়জামা পরিধান করা। তদ্রূপ সেলাই করা মোজাও পরিধান করা যাবে না।

কারণ এহরাম বাঁধা ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে জামা, পাগড়ী, কোট, পায়জামা এবং এমন কাপড় পরিধান করতে পারবে না যাতে সুগন্ধি বা জাফরান রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তারা মোজাও পরিধান করতে পারবে না। [বুখারী, মুসলিম]

৫. সুগন্ধি ব্যবহার। মুহরিম ব্যক্তির জন্য পোষাক বা দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এহরাম বাঁধা ব্যক্তিকে বলেছেন, তুমি কোনো সুগন্ধি স্পর্শ কর না। (সহীহ মুসলিম) এসময় স্বেচ্ছায় কোনো সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া থেকেও বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. স্থল প্রাণী শিকার। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

অর্থাৎ আর স্থলচর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ তোমরা এহরাম বাঁধা অবস্থায় থাক। আর তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। [সূরা মায়েদা- ৯৬]

৭. নিজে বিয়ে করা বা অন্যকে বিয়ে করানো। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুহরিম (এহরাম বাঁধা ব্যক্তি) বিয়ে করতেও পারবে না। তাকে কেউ বিয়ে দিতেও পারবে না। [সহীহ মুসলিম]

৮. সহবাস করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ.

অর্থাৎ অতপর যে কেউ এসব মাসে হজ্জ করার মনস্থ করে, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-মিলন, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ করা জায়েয নয়। তোমরা যেসব উত্তম কাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। তোমরা পাথেয় সাথে নিও। নিসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। হে জ্ঞানীরা! তোমরা আমাকেই ভয় কর। [সূরা বাকারা- ১৯৭]

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এখানে রাফাস তথা অশ্লীলতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সহবাস করা।

হালালের প্রথম ধাপের পূর্বে কেউ সহবাস করলে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় তার হজ্জ আদায় করতে হবে। সেই সাথে এবার তার উট জবাই করা ওয়াজিব। আর যদি প্রথম ধাপের পর, চূড়ান্ত ধাপের পূর্বেই সহবাস করে ফেলে তাহলে বকরী জবাই করা ওয়াজিব।

৯. কোনো মহিলা বা স্বীয় স্ত্রীকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করা বা চুম্বন ইত্যাদি করা।

হাজীর জন্য এসব নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। যেন তার হজ্জ কলুষিত বা বিনষ্ট না হয়। কেউ করে ফেললে তার হকুম মাত্রই আলোচিত হল। এর বেশি বিস্তারিত বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেয়ার সুযোগ নেই। সময় সুযোগে সেগুলো জানতে উলামায়ে কেরামের দারস্থ হতে হবে।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তিনি আমাদের ইবাদতগুলোকে কবুল করেন এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে সেগুলো আদায়ের তাওফিক দান করেন।
আমীন।

সমাপ্ত